# গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়ার বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৬১ বর্ষ ৩৯ সংখ্যা ২৯ মে - ৪ জুন, ২০০৯ | প্রধান সম্পাদক ঃ রণজিৎ ধর | www.ganadabi.in | মূল্য ঃ ২ টাকা


## ৫৫ শতাংশ সাংসদ কোটিপতি

# এঁরা দেখবেন সাধারণ মানুষের স্বার্থ !

এবারের লোকসভা নির্বাচনে যাঁরা বিজয়ী হয়েছেন, তাঁদের ৫৫ শতাংশেরও বেশি কোটিপতি। নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রার্থীরা তাঁদের সম্পত্তির যে হিসাব দাখিল করেছেন, বহুক্ষেত্রেই তাতে সম্পত্তির সামান্য অংশই দেখানো হয়। এই হিসাবেও দেখা যাচ্ছে, ৫৪৩ জন সাংসদের মধ্যে কোটিপতির সংখ্যা ৩০০। গত লোকসভায় কোটিপতি এম পির সংখ্যা ছিল ১৫৪ জন। এবার তা বেড়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। পার্টিগত বিচারে কোটিপতি এমপির সংখ্যায় এগিয়ে কংগ্রেস। তাদের ২০৬ এমপি'র মধ্যে ১৩৮ জন, অর্থাৎ ৬৭ শতাংশ এমপি'ই কোটিপতি। শুধু কংগ্রেসেরই নয়, বিজেপির ১১৬ জন এমপি'র মধ্যে ৫৮ জন কোটিপতি। এছাড়া সমাজবাদী পার্টির ১৪ জন, বিএসপি'র ১৩ জন, ডিএমকে'র ১১ জন, শিবসেনার ৯ জন এবং জনতা দল (এস)-এর ৮ জন এম পি কোটিপতি।

সংসদে প্রকৃত গরিব মানুষদের প্রতিনিধি কোথায়? ভারতের যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ গরিব, তাদের অধিক প্রতিনিধিত্ব যদি অন্তত পার্লামেন্টে না থাকে তাহলে সেই পার্লামেন্ট জনস্বার্থে সামান্য হলেও কাজ করতে পারে কি? আবার পার্লামেন্টে কোনও গরিব মানুষের প্রতিনিধি এলেই গরিবের স্বার্থে কাজ করবে, গরিবের পক্ষে নীতি নির্ধারণে পার্লামেন্টে সোচ্চার হবে — এমনটা নাও হতে পারে। কোনও এম পি পার্লামেন্টে গরিবের হয়ে কথা বলবে কি না, কতদূর বলবে, সরকার জনবিরোধী নীতি নিলে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামে কতদূর এগোবে, না নীরবে-সরবে সমর্থন করবে, ইত্যাদি বিষয় নির্ভর করে সেই প্রতিনিধি যে দলের টিকিটে লড়েছেন, সেই দলের দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি-আদর্শের উপর। এই নিরিখে বিচার করলে শ্রমিকশ্রেণীর একটি প্রকৃত বিপ্লবী দল ছাড়া পার্লামেন্টে যথার্থ অর্থে গরিবের হয়ে কেউ লড়াই চালাতে পারে না। কিন্তু নির্বাচন ব্যবস্থাকে বর্তমানে এত অর্থনির্ভর, মাফিয়ানির্ভর এবং মিডিয়ানির্ভর করে তোলা হয়েছে যে, এসবের বিরুদ্ধে পাল্লা দিয়ে একটি প্রকৃত শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী দলের নির্বাচনে জেতাই কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ছে। নির্বাচন কমিশনও নির্বাচনবিধি সংস্কারের নামে যে সব বিধিনিষেধ আরোপ করছে, তাতে সবচেয়ে বেশি বাধার সম্মুখীন হচ্ছে গরিবের দল। এই অবস্থায় পার্লামেন্টে গরিবের প্রতিনিধি দিনে দিনে যে কমবে — এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

বিশ্বের সব থেকে বেশি গরিব মানুষের বাস ভারতবর্ষে। রাষ্ট্রসংঘের হিসাব অনুযায়ী ভারতের ২৮ কোটি মানুষ দারিদ্রসীমার নিচে বাস করেন। এদের বলা হয় চরম দরিদ্র। দারিদ্রসীমার কাছাকাছি উপরে যাদের অবস্থান, তাদের অবস্থাও দুর্বিষহ। এই সমস্ত হিসাব একসঙ্গে ধরলে বোঝা যায়, ভারতের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই দরিদ্র। সরকারি তথ্যই বলছে, দেশের ৭৭ শতাংশ মানুষের দৈনিক আয় ২০ টাকার কম। অন্যদিকে কোটিপতিদের সম্পত্তি লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। ২০০৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, দেশে ৫ কোটি টাকারও বেশি ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী মানুষের সংখ্যা ৮৩ হাজার। এই কোটিপতি সমাজ থেকেই সংসদীয় দলগুলি প্রার্থী করছে। সব রাজ্যে নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছে মূলত ধনীঘরের লোকেরা। গরিবরা এই ধনী প্রার্থীদের জেতাচ্ছে। তাদের থেকেই মন্ত্রী হচ্ছে। সংসদে প্রথম পর্যায়ে শপথ নেওয়া ২০ জন মন্ত্রীর মধ্যে ১২ জনই কোটিপতি। তাহলে এ হেন সংসদ থেকে গরিবের স্বার্থ কতদূর পূরণ হবে?

কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ শিবির বিজেপি'র তুলনায় ভাল ফল করেছে। কংগ্রেসের ক্ষমতায় ফিরে আসাকে ভারতের পুঁজিপতিশ্রেণী একবাক্যে স্বাগত জানিয়েছে। ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ-এর প্রেসিডেন্ট হর্ষপতি সিঙ্গানিয়া বলেছেন, গোটা বিশ্বের কাছে এবং দেশের গণতন্ত্রের কাছে এটা একটা ইতিবাচক সংকেত যে, ভারতের নির্বাচকমণ্ডলীর একটা উচ্চপর্যায়ের পরিপক্কতা (maturity) এসেছে। অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার্স অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ (অ্যাসোচেম)-এর প্রেসিডেন্ট সজ্জন জিন্দাল, পি এইচ ডি চেম্বার প্রেসিডেন্ট সতীশ বাজোরিয়া, ইন্দো-আমেরিকান চেম্বার্স অব কমার্স-এর প্রেসিডেন্ট এস কে জৈন, অ্যাসোসিয়েশন অব সফ্‌টওয়্যার অ্যান্ড সার্ভিস কোম্পানি সহ পুঁজিপতিদের বিভিন্ন সংগঠনের কর্তারা ইউ পি এ-র জয়ে উল্লসিত। ফলে এটা স্বাভাবিক, এরকমই

চারের পাতায় দেখুন

## ঘূর্ণিঝড়ে বিপর্যস্ত মানুষের জন্য প্রশাসনের

## যুদ্ধকালীন তৎপরতা দাবি করলেন সাংসদ তরুণ মণ্ডল

২৪ মে সন্ধ্যা থেকে প্রবল ঘূর্ণিঝড়ের ফলে জলোচ্ছাসে ও বাঁধ ভেঙে যাওয়ার ফলে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত, হাজার হাজার ঘর ভেঙেছে, জল ঢুকেছে গ্রামে গ্রামে। জলবন্দী মানুষ প্রবল বর্ষায় খোলা আকাশের নিচে রয়েছে। ২৫ মে জয়নগর থেকে সদ্য নির্বাচিত সাংসদ কমরেড তরুণ মণ্ডল ক্যানিং এস ডি ও-র সাথে দেখা করে উদ্ধার ও ত্রাণে তৎপর হতে বলেন।

কুলতলি, গোসাবা, বাসন্তী, পাথরপ্রতিমা, রায়দিঘী, ক্যানিং-এর বিভিন্ন এলাকার দুরবস্থার কথা ২৫ মে সকালেই রাজ্য সরকার ও প্রশাসনের কর্তাদের জানান এস ইউ সি আই নেতা বিধায়ক কমরেড দেবপ্রসাদ সরকার। তিনি মন্ত্রীদের কাছে দাবি জানান, ত্রাণ ও উদ্ধারকার্যের জন্য সামরিক বাহিনী নিয়োগ করতে হবে। কুলতলির বিধায়ক কমরেড জয়কৃষ্ণ হালদার অঞ্চলে অঞ্চলে উদ্ধারকাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

আটের পাতায় দেখুন

# কারচুপি করেই সরকার দেশে গরিবের সংখ্যা কমিয়ে দেখাচ্ছে

বিপিএল তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তি নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই রাজ্য জুড়ে নানা প্রশ্ন উঠছে। গরিব যখন আরও গরিব হচ্ছে, ভয়াবহ দারিদ্র যখন ক্রমেই আরও বেশি সংখ্যক মানুষের জীবনকে ছারখার করে দিচ্ছে, তখন সরকারি হিসাবে আশ্চর্যজনকভাবে বিপিএল তালিকার অন্তর্ভুক্ত দরিদ্র মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত কমছে। রেশনে কম দামে চাল-গম পাওয়া থেকে শুরু করে হাসপাতালে বিনা পয়সায় বেড পাওয়া, ইত্যাদি যেটুকু সরকারি সুযোগ সুবিধা এখনও বহাল রয়েছে, তা পেতে হলে বিপিএল কার্ড থাকা অত্যন্ত জরুরি। অথচ দেখা যাচ্ছে, অসংখ্য হতদরিদ্র মানুষের কাছেই বিপিএল কার্ড নেই। শুধু তাই নয়, বহু ক্ষেত্রেই অনেক অবস্থাপন্ন মানুষের নাম বিপিএল তালিকায় ঢুকে যাচ্ছে।

সরকারি হিসাবে কতটা কমেছে দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষ, তথা দরিদ্র জনসাধারণের সংখ্যা? যোজনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, ১৯৯৩-৯৪ সালে গ্রামীণ জনসংখ্যার ৩৭.৩ শতাংশ দারিদ্ররেখার নিচে বাস করত। সরকারি হিসাবে দরিদ্র মানুষের সংখ্যা কমে গিয়ে ১৯৯৯-২০০০ সালে ২৭.৪ শতাংশে নেমে এসেছিল। ২০০৪-০৫ সালে সামান্য বেড়ে দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা পৌঁছেছে ২৮.৩ শতাংশে। আবার ২০০৭-০৮ সালে এই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬ শতাংশে। ২০০৬ সালে প্রকাশিত বিশ্বব্যাঙ্কের উন্নয়ন রিপোর্টেও বলা হয়েছে, ভারতের গ্রামীণ জনসংখ্যার ৩০.২ শতাংশ দারিদ্ররেখার নিচে রয়েছে।

সরকারি হিসাবে দরিদ্রের সংখ্যা যখন ক্রমাগত কমছে, বাস্তব পরিস্থিতি কিন্তু তখন ঠিক তার বিপরীত কথা বলছে। গ্রামীণ উন্নয়ন খাতে সরকারি খরচ বিপুল পরিমাণে কমে যাওয়ার সাথে সাথে চূড়ান্ত দারিদ্রের আঘাতে মেহনতি মানুষের জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে। মাথাপিছু খাদ্যগ্রহণের পরিমাণ কমছে, ঋণের বোঝায় নুয়ে পড়েছে কৃষক, উৎপাদিত ফসলের দাম পাচ্ছে না চাষি। দেশজুড়ে আজ ঋণগ্রস্ত অসংখ্য কৃষক আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে বাধ্য হচ্ছে। সর্বত্র অনাহারে মৃত্যুর ঘটনা ঘটছে। শহরাঞ্চলের অবস্থাও একই রকম। সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান কমছে। ঠিকা শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে। চতুর্দিকে ভয়াবহ বেকারত্ব। শপিং মল, নতুন নতুন পার্ক আর ফ্লাইওভারে শহরকে যত ঝকঝকে করার চেষ্টা করছে বিভিন্ন রাজ্যের সরকার, তাদের সে চেষ্টায় জল ঢেলে দিচ্ছে ফুটপাতে, ব্রিজের নিচে আশ্রয় নেওয়া ক্রমাগত বাড়তে থাকা নিঃস্ব মানুষের ঢল।

'বিপিএল' অর্থাৎ 'বিলো পভার্টি লাইন' কথাটির মানে হল, দারিদ্রসীমার নিচে থাকা মানুষজন। কীভাবে নির্ধারণ করা হয় এই দারিদ্রসীমা? দরিদ্র হিসাবেই বা কাদের ধরা হয়? মানুষের বেঁচে থাকার জন্য ন্যূনতম যে জিনিসগুলি প্রয়োজন, খাদ্য তাদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান হওয়ায়, দারিদ্ররেখা নির্ধারণ করতে গিয়ে তার মাপকাঠি ধরা হয়েছিল খাদ্য তথা পুষ্টির মাত্রাকে। অন্যান্য

দুয়ের পাতায় দেখুন

## বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে বার্লিনে লক্ষাধিক মানুষের মিছিল

**১৬ মে জার্মানির রাজধানী বার্লিনে ১ লক্ষ শ্রমিক-কর্মচারী বিশ্বায়ন-উদারীকরণের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখায়। বিশ্বায়নের নির্দেশিকা মেনে জার্মানির সরকার সামাজিক ক্ষেত্রগুলি থেকে হাত গুটিয়ে নিচ্ছে, সেগুলি তুলে দেওয়া হচ্ছে ব্যবসায়ীদের মুনাফা করার জন্য। তার ফলে জার্মানির মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক সঙ্কট আরও ঘনীভূত হচ্ছে। তীব্র মন্দার কারণে ইউরোপের বিভিন্ন দেশগুলিতে অর্থনীতির টালমাটাল অবস্থা। উদ্বেগজনক অবস্থা জার্মানিরও। সেখানে একটার পর একটা কারখানায় তালা ঝুলছে। ঘরে ঘরে বেকার। দেশজুড়ে আওয়াজ উঠেছে মজুরি বাড়াও। আওয়াজ উঠেছে ব্যবসায়িক ক্ষেত্র, ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ জারি করা হোক। শ্রমিক-কর্মচারীদের এই বিক্ষোভকে সংগঠিত রূপ দিতে এ দিনের প্রতিবাদী সমাবেশের ডাক দিয়েছিল কনফেডারেশন অফ জার্মান ট্রেড ইউনিয়ন।**

# গরিবের সংখ্যা কমিয়ে দেখাচ্ছে

একের পাতার পর

খরচ, যেমন, বাসস্থান, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা — এসব হিসাবের মধ্যে ধরাই হয়নি। ভারতের গ্রামাঞ্চলের যে সমস্ত মানুষ মাথাপিছু দৈনিক ২৪০০ ক্যালরির কম এবং শহরাঞ্চলের যে সব মানুষ মাথাপিছু দৈনিক ২১০০ ক্যালোরির কম পুষ্টি পান, তাঁদের দরিদ্র বলে চিহ্নিত করা হয়েছিল। এই পরিমাণ পুষ্টি পেতে হলে প্রতি মাসে মাথাপিছু কত টাকা খরচ করতে হয়, তারও হিসাব স্থির করা হয়েছিল। ১৯৭৩-৭৪-এ ২৮তম জাতীয় নমুনা সমীক্ষায় পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ১৯৭৩-৭৪ সালের মূল্যমান অনুযায়ী এই খরচের পরিমাণ ছিল, গ্রামাঞ্চলে মাসিক মাথাপিছু ৪৯.০৯ টাকা এবং শহরাঞ্চলে মাসিক মাথাপিছু ৫৬.৬৪ টাকা। এই হিসাব অনুযায়ী ১৯৯৯-২০০০ সালে গ্রামে মাথাপিছু মাসিক খরচ নির্ধারিত করা হয়েছে ৩২৭.৫৬ টাকা এবং শহরে ৪৫৪.১১ টাকা। ২০০৪-০৫ সালে এই হিসাব যথাক্রমে ৩৫৬.৩০ টাকা এবং ৫৩৮.৬০ টাকা।

পরবর্তী সময়ে দারিদ্ররেখা নির্ণয় করতে গিয়ে ভারতের যোজনা কমিশন, জাতীয় নমুনা সমীক্ষা থেকে পাওয়া তথ্যের সাহায্য নেয়নি। তার বদলে পরোক্ষ পদ্ধতিতে, অর্থাৎ খেতমজুরদের জন্য যে মূল্যসূচক হিসাব করা হয়েছে, তা দিয়ে আগের বছরের দারিদ্ররেখাকে গুণ করে পরের বছরের দারিদ্ররেখা নির্ণয় করা হয়েছে। এই পরোক্ষ পদ্ধতিতে হিসাব করার মধ্যেই দারিদ্ররেখার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত কমে যাওয়ার রহস্য নিহিত আছে।

এবার 'ইকনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল উইকলি'র ২৮ জুলাই-৩ আগস্ট, '০৭ সংখ্যায় প্রকাশিত জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ১৯৯৯-২০০০ সালের ৫৫ তম দফার তথ্যের দিকে তাকানো যাক। সেখানে গ্রামাঞ্চলে মাসিক মাথাপিছু কত টাকা খরচ হলে পুষ্টির পরিমাণ কত হয়, এবং কত শতাংশ মানুষ ঐ পরিমাণ টাকা খরচ করতে পারে, সে সংক্রান্ত তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। বোঝবার সুবিধার জন্য তথ্যগুলি তুলে ধরা হল (সারণী)। সরকারি এই তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে, ১৯৯৯-২০০০ সালে ২৪০০ ক্যালরি পুষ্টিদায়ক খাদ্যের জন্য প্রতি মাসে মাথাপিছু ৫২৫-৬১৫ টাকা খরচ করা প্রয়োজন। যে মানুষগুলি মাসে মাথাপিছু এই টাকা খরচ করতে পারে না, তাদের সংখ্যা, তথ্যে দেখা যাচ্ছে প্রায় ৮০ শতাংশ। অথচ যোজনা কমিশন পরোক্ষ পদ্ধতিতে হিসাব করে দেখাচ্ছে, এই সময়ে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা মাত্র ২৭.৪ শতাংশ। তথ্য থেকে এও দেখা যাচ্ছে, যোজনা কমিশন ১৯৯৯-২০০০ সালে মাথাপিছু মাসিক যে ৩২৭.৫৬ টাকা খরচকে দারিদ্র্যরেখা বলে স্থির করেছে, ঐ পরিমাণ টাকা খরচ করতে পারলে, ১৯৯৯-২০০০ সালে পুষ্টি পাওয়া যায় মাথাপিছু ১৮৬৮ ক্যালরি। পুষ্টির এই পরিমাণ, ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পুষ্টির চেয়ে ৫৩২ ক্যালরি কম। অর্থাৎ হিসাবের কারচুপি করে ভারতের যোজনা কমিশন শুধু যে দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা প্রকৃত সংখ্যার থেকে কমিয়ে দেখাচ্ছে তাই নয়, গরিবের সংখ্যা খাতায়-কলমে কমানোর জন্য মাথাপিছু প্রয়োজনীয় ন্যূনতম পুষ্টির পরিমাণও কম করে ধরেছে। অথচ এই ন্যূনতম প্রয়োজনীয় পুষ্টির মাত্রা নির্ধারণ করেছিল এই যোজনা কমিশনই।

বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ সরকার, অথবা কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউ পি এ সরকার, কেন্দ্রে যে সরকারই ক্ষমতায় বসেছে, ভারতীয় অর্থনীতির বিপুল অগ্রগতির ঢাক পিটিয়েছে। জাতীয় আয় বৃদ্ধির হারের আকাশছোঁয়া লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে এমন ভাবে প্রচার চালিয়েছে, যেন ঐ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে পারলেই ভারতবাসীর জীবনের সকল সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। বলা হয়েছিল, উপরতলার সমৃদ্ধি চুঁইয়ে নামবে নিচের তলায়। উন্নয়নের এই মিথ্যা প্রচারকে সত্য বলে দেখানোর জন্য ক্ষমতাসীন সরকারগুলি যেন তেন প্রকারেণ দরিদ্রের সংখ্যা কমিয়ে দেখাবার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাদের এই প্রচার, শুধুই যে সংখ্যাতত্ত্বের কারচুপি, বাস্তবের সঙ্গে যা কোনওভাবেই মেলে না, আরও একটি তথ্যে তা প্রমাণ হয়ে যায়। ভারতের যোজনা কমিশন ২০০৪-০৫ সালে মাসিক মাথাপিছু ৩৫৬ টাকা ব্যয়কে দারিদ্র্যরেখা হিসাবে ধরেছে। এর অর্থ, যে মানুষগুলির দৈনিক মাথাপিছু ন্যূনতম ১২ টাকার বেশি ব্যয় করার সামর্থ্য নেই, তারাই দরিদ্র বলে চিহ্নিত হয়ে বিপিএল তালিকাভুক্ত হবে। এর থেকে সামান্য বেশি ব্যয় করার ক্ষমতা যাদের আছে, তাদের কাউকেই দারিদ্র্যসীমার নিচে জায়গা দেওয়া হবে না। আজকের বাজারে সংসার চালানোর অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে, তাঁদের কাউকেই বুঝিয়ে বলার দরকার নেই যে, দৈনিক মাথাপিছু ১৩ টাকায়, খুব বেশি হলে, দু'বেলা শুধু নুন-ভাতটুকুই জোটানো যায়, মানুষের মতো করে বাঁচা যায় না। অথচ সরকার এই মানুষগুলিকে কোনমতেই দরিদ্র বলে মানতে নারাজ। এইভাবে সম্পূর্ণ বাস্তব বিবর্জিত মিথ্যা হিসাব দেখিয়ে সরকার বছরে বছরে খাতায়-কলমে দরিদ্রের সংখ্যা ক্রমাগত কম করে দেখিয়ে দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির ঢাক পিটিয়ে চলেছে।

এ রাজ্যের পরিস্থিতিও অন্য রকম কিছু নয়। দীর্ঘ ৩২ বছর ধরে 'মার্কসবাদী' নামধারী সিপিএম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় থেকে একের পর এক জনস্বার্থবিরোধী কার্যকলাপ চালিয়ে একদিকে পশ্চিমবঙ্গের খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে, অন্যদিকে হিসাবের কারচুপি করে দরিদ্রের সংখ্যা কম করে দেখিয়ে ক্রমেই বিপিএল তালিকা ছোট করে চলেছে। রাজ্যে গরিবের সংখ্যা কম করে দেখাতে গিয়ে তারা একটি ধূর্ত কৌশল নিয়েছে। সিপিএম সরকারের মন্ত্রী-আমলারা দারিদ্র পরিমাপের জন্য ১২ দফার একটি মাপকাঠি তৈরি করেছেন। এতে আছে ১২টি সূচক। প্রতিটি সূচকে ৫টি করে পরিস্থিতির কথা বলা আছে। যেমন, ৩ নং সূচকের বিষয় হল, 'গড়পড়তা পরিচ্ছদের সংখ্যা (প্রতি সদস্য পিছু)'। এর অন্তর্গত ৫টি পরিস্থিতি হল, ১) ২-এর কম, ২) ২-৪, কিন্তু কোনও শীতবস্ত্র নেই, ৩) ২-৪, শীতবস্ত্র সহ, ৪) ৪ বা তার বেশি, কিন্তু ৬-এর কম, ৫) ৬-এর বেশি। অনুসন্ধানকারী প্রতিটি পরিবারের সঙ্গে কথা বলে সর্বাধিক প্রযোজ্য ঘরটি ভর্তি করবেন। কিন্তু উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এই ১২টি সূচকে দারিদ্র মাপার মূল বিষয় পুষ্টির পরিমাণ সম্পর্কে একটি কথাও নেই। ফলে, পুষ্টির পরিমাণ মাথাপিছু ২৪০০ ক্যালরির অনেক কম হলেও এই সূচক অনুযায়ী বহু মানুষই দারিদ্র্যসীমার উপরে ঠাঁই পাচ্ছেন। এমন সূচকের হিসাবে, অনেক ক্ষেত্রে, ঘরে একটা প্রেশার কুকার বা লঝঝড়ে সাইকেল থাকলেও মানুষ দারিদ্রসীমার ওপরে চলে যাচ্ছে। একটা শিশু যদি মিড ডে মিলের টানে সরকারি পাঠশালায় 'পড়তে' যায়, তাহলেও অনেক সময় সেই পরিবার সরকারি হিসাবে গরিব বলে গণ্য হয় না। এইভাবেই কমানো হচ্ছে বিপিএলভুক্ত মানুষের সংখ্যা। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বিপুল দুর্নীতি। সস্তায় রেশনে চাল-গম পেতে কিংবা সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সার বেডের সুবিধা পেতে, আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন বহু রাজনৈতিক প্রভাবশালী মানুষের নামই জেলায় জেলায় বিপিএল তালিকাভুক্ত হতে দেখা গেছে, আবার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে না খেতে পাওয়া অসংখ্য মানুষ। এই নিয়ে রাজ্য জুড়ে জেলায় জেলায় প্রবল বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে মানুষ।

আন্দোলনের চাপে সাধারণ মানুষ যেটুকু সরকারি সুযোগসুবিধা আদায় করেছে, নানা ধূর্ত কলাকৌশলে সেটুকু থেকেও তাদের বঞ্চিত করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্র ও রাজ্যের সরকারগুলি। দারিদ্র্যসীমার নিচে থাকা মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত কমিয়ে দেওয়া হল সে'রকমই একটি কৌশল। কেবলমাত্র ঐক্যবদ্ধ, শক্তিশালী ও লাগাতার গণআন্দোলনের মধ্য দিয়েই সরকারকে এই ঘৃণ্য ধূর্ততা বন্ধ করতে বাধ্য করা যায়।

(তথ্য সহায়তা ঃ 'প্রকৃত দারিদ্র ও বিপিএল তালিকা, সরকারি হিসাবের কারচুপি' — সন্তোষ রাণা)

**সারণি**

**গ্রামাঞ্চলে মাসিক মাথাপিছু খরচের ভিত্তিতে জনসংখ্যার বণ্টন, গড় খরচ ও দৈনিক ক্যালরি গ্রহণের পরিমাণ। ১৯৯৯-২০০০, সারা ভারত**

| মাসিক মাথাপিছু খরচের শ্রেণী (টাকায়) | গড় খরচ | মাথাপিছু দৈনিক ক্যালরি | জনসংখ্যার শতাংশ | জনসংখ্যার পুঞ্জীভূত* শতাংশ |
|---|---|---|---|---|
| ২২৫ টাকার কম | ১৯১ | ১৩৮৩ | ৫.১ | ৫.১ |
| ২২৫-২৫৫ | ২৪২ | ১৬০৯ | ৫.০ | ১০.১ |
| ২৫৫-৩০০ | ২৭৯ | ১৭৩৩ | ১০.১ | ২০.২ |
| ৩০০-৩৪০ | ৩২১ | ১৮৬৮ | ১০.০ | ৩০.২ |
| ৩৪০-৩৮০ | ৩৬১ | ১৯৫৭ | ১০.৩ | ৪০.৫ |
| ৩৮০-৪২০ | ৪০০ | ২০৫৪ | ৯.৭ | ৫০.২ |
| ৪২০-৪৭০ | ৪৪৫ | ২১৭৩ | ১০.২ | ৬০.৪ |
| ৪৭০-৫২৫ | ৪৯৭ | ২২৮৯ | ৯.৩ | ৬৯.৭ |
| ৫২৫-৬১৫ | ৫৬৭ | ২৪০৩ | ১০.৩ | ৮০.০ |
| ৬১৫-৭৭৫ | ৬৮৬ | ২৫৮১ | ৯.৯ | ৮৯.৯ |
| ৯৫০-এর বেশি | ১৩৪৪ | ৩১৭৮ | ৫.০ | ৯৯.৯ |

(উৎসা পট্টনায়েকের প্রবন্ধে উদ্ধৃত)

* পুঞ্জীভূত শতাংশের অর্থ ঐ শ্রেণীর নিচে মোট যে শতাংশ মানুষ আছেন।

# পার্টিকর্মীর জীবনাবসান

বাঁকুড়া জেলার হিড়বাঁধ ব্লকের এস ইউ সি আই সংগঠক কমরেড দীপেন মণ্ডল ৩১ মার্চ চিকিৎসার জন্য কলকাতায় যাওয়ার পথে আকস্মিকভাবে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তিনি কিছুদিন যাবৎ স্নায়ুরোগে ভুগছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল মাত্র ৩৭ বছর। ১ এপ্রিল তার মরদেহ দেউলাগোড়া-ডুয়াকানা গ্রামে নিয়ে আসা হলে পরিবারের লোকজন ও গ্রামবাসীরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। এলাকার এস ইউ সি আই কর্মী-সমর্থকরা প্রয়াত কমরেডের বাড়ি যান, বৈপ্লবিক শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। গ্রামেই শেষকৃত্য সম্পন্ন করা হয়।

হিড়বাঁধ ব্লক এলাকায় ১৯৯২ সালের মাঝামাঝি সময়ে, কমরেড দীপেন মণ্ডল দলের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসেন এবং দলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে নিজেকে গড়ে তোলার সংগ্রামে আত্মনিয়োগ করেন। পাড়াপ্রতিবেশীদের সমস্যায়, বিপদে আপদে সাহায্যের ক্ষেত্রে সর্বদা অগ্রণী ভূমিকা নিতেন কমরেড মণ্ডল। নাটক ও সঙ্গীতের গভীর অনুরাগী ছিলেন তিনি। পাড়ার ক্লাবের তিনি ছিলেন অন্যতম সংগঠক।

১১ এপ্রিল বিকাল ৪টায় হিড়বাঁধ লোকাল কমিটির উদ্যোগে দেউলাগোড়া-ডুয়াকানা উচ্চ বিদ্যালয়ে কমরেড দীপেন মণ্ডলের স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন দেউলাগোড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও অন্য শিক্ষকরা, বিদ্যালয় পরিচালন কমিটির সম্পাদক ও অন্য সদস্যরা, ডুয়াকানা নিউ তরুণ সংঘ, পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু ক্লাব ও লাইব্রেরি, মোসনেহা আদিবাসী ক্লাব ও লাইব্রেরি, যাদব কল্যাণ সমিতি (রাঢ় পশ্চিম সীমান্ত) সহ বিভিন্ন সংস্থার কর্মকর্তাগণ ও এলাকার বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দ। সভা পরিচালনা করেন এস ইউ সি আই হিড়বাঁধ লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড নরেন্দ্রনাথ কুন্ডকার। শোকপ্রস্তাব পাঠ করেন কমিটির সদস্য কমরেড অসিতবরণ মণ্ডল। সভায় প্রধান বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাঁকুড়া জেলা (বর্ধিত) কমিটির সদস্যা কমরেড লক্ষ্মী সরকার।

**কমরেড দীপেন মণ্ডল লাল সেলাম**

# পানীয় জল ঃ পুরুলিয়ায় পথ অবরোধ

পুরুলিয়া জেলার রঘুনাথপুর ও আদ্রা শহরে পানীয় জলের দাবিতে ১৯ মে কয়েকশো মানুষ পথ অবরোধ করে। রঘুনাথপুর শহরে ইন্দো-জার্মান জলপ্রকল্পের জলসরবরাহ এতই অনিয়মিত হয়ে পড়েছে যে প্রতিটি ওয়ার্ডেই প্রখর গ্রীষ্মের মধ্যে মানুষ পানীয় জলটুকুও ঠিক মতো পাচ্ছে না। রঘুনাথপুরে পৌরসভা জলের জন্য পরিবার পিছু মাসিক ৯৮ টাকা হারে জলকর আদায় করে, শহরের অধিকাংশ মানুষের পক্ষে যা বিরাট বোঝা। যারা অতিরিক্ত পয়সা দিয়ে বাড়িতে কানেকশন নিয়েছেন তাদেরও জল অমিল। কয়েকটি ওয়ার্ড একেবারেই জলশূন্য। কয়েক মাস আগে এলাকার মানুষ নাগরিক সম্মেলন করে তাদের সমস্যা তুলে ধরেন। রঘুনাথপুর জলপ্রকল্প থেকেই আদ্রা রেল শহরে জল সরবরাহ শুরু করলে সমস্যা আরও বেড়ে যায়। এলাকার মানুষ দুটি শহরেই পৃথক সরবরাহ ব্যবস্থার দাবি জানায়। কর্তৃপক্ষ দাবিতে কর্ণপাত না করায় মহিলাদের নেতৃত্বে শত শত মানুষ বরাকর রোড অবরোধ করেন। সাড়ে তিনঘণ্টা অবরোধ চলে। অবশেষে মহকুমা শাসকের প্রতিনিধি, পৌরসভার চেয়ারম্যান, ভাইস চেয়ারম্যান পাঁচ দিনের মধ্যে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস জানালে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। এস ইউ সি আই রঘুনাথপুর শহর কমিটির পক্ষ থেকে এই আন্দোলনের জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের অভিনন্দন জানিয়ে সমস্যা সমাধানে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়।

# পরীক্ষায় বসতে দেওয়ার দাবিতে ছাত্রবিক্ষোভ প্রসঙ্গে

এপ্রিল মাস জুড়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন কলেজে ছাত্র বিক্ষোভ গুরুতর রূপ নিয়েছিল। কলেজ পরীক্ষায় বিভিন্ন বিষয়ে যারা অনুত্তীর্ণ হয় এবং কলেজে উপস্থিতির হারও যাদের কম, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুযায়ী তাদের পরীক্ষায় বসার ফর্ম দিতে কলেজ কর্তৃপক্ষ অস্বীকার করে। এর বিরুদ্ধে ছাত্রছাত্রীরা বিক্ষোভ শুরু করে। সন্তানদের ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় অভিভাবকরাও ঘটনায় জড়িয়ে যান। সব মিলিয়ে বিষয়টি এমন জায়গায় পৌঁছায় যে সংবাদ মাধ্যমেও তা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হয়ে দাঁড়ায়।

ঘটনার সূত্রপাত দেশবন্ধু গার্লস কলেজে। সেখানে ছাত্রীদের ঘেরাও-এর ফলে শেষ পর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ দাবি মেনে নেয়। উত্তর কলকাতার সিটি কলেজেও দু'দিন ধরে ঘেরাও থাকেন কলেজ অধ্যক্ষ সহ অন্যান্য শিক্ষকরা। ছাত্ররা কলেজে ভাঙচুরও চালায়। শেষ পর্যন্ত সেখানেও দাবি মেনে নেওয়া হয়। সংবাদমাধ্যমে এই কলেজ দুটির দাবি মেনে নেওয়ার খবর প্রচারিত হতে থাকে। স্বভাবতই তার প্রভাব অন্যান্য কলেজে ফর্ম না পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের উপর পড়ে।

দক্ষিণ কলকাতার যোগমায়া দেবী কলেজ এবং মুরলীধর গার্লস কলেজেও যেসব ছাত্রী একই কারণে ফর্ম পায়নি তারা বিক্ষোভ শুরু করে। যোগমায়া দেবী কলেজে এই প্রথম বহু সংখ্যক ছাত্রী এই কারণে আটকে যায়। ডি এস ও পরিচালিত ছাত্রী সংসদের নেতৃত্বে ছাত্রীরা কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে ধর্না দিলে বেশিরভাগ ছাত্রীকে অভিভাবকদের দায়িত্বে ফর্ম পূরণ করতে অনুমতি দেওয়া হয়। বাকি ছাত্রীদের ক্ষেত্রেও এরকম কোনও ব্যবস্থা নেওয়া যায় কি না সেই বিষয়ে যখন আলাপ আলোচনা চলছে, তখন সিটি বা দেশবন্ধু কলেজের ঘটনার সূত্রে এদের মধ্যে প্রশ্ন ওঠে, যদি ঐ কলেজগুলোতে এ ধরনের ছাত্রদের রেহাই দেওয়া হয়, তা হলে অন্য কলেজেও তা হবে না কেন? ছাত্রী সংসদ বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে উত্থাপন করে। বহিরাগত ছেলেরা এবং অভিভাবকরা যে কোনও প্রকারে এই দাবি আদায়ের জন্য চাপ দিতে থাকে ছাত্রী সংসদের উপর। তখন দেশবন্ধু বা সিটি কলেজের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্রী সংসদ ফর্ম না পাওয়া ছাত্রীদের ঘেরাও আন্দোলনের পাশে দাঁড়ায়। উল্লেখ্য যে, যোগমায়া দেবী কলেজের সাথে একই বিল্ডিং-এর আশুতোষ কলেজে ও শ্যামাপ্রসাদ কলেজে ক্লাস না করা বা পরীক্ষায় কম নম্বর পাওয়া ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রে কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনও শাস্তিমূলক পদক্ষেপই নেয়নি। সেখানে ছাত্র সংসদে শাসকদলের ছাত্র সংগঠন এস এফ আই রয়েছে। তাই বোধ হয়, লোকসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পরিকল্পিতভাবেই কোনও সমস্যা সৃষ্টি করা হয়নি। ছাত্রী বা অভিভাবকেরা দেখলেন, একই অপরাধে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে থাকা বিভিন্ন কলেজে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এতে ছাত্রীদের বিক্ষোভ বেড়ে যায়।

ছাত্রীরা যে দিন যোগমায়া দেবী কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের ঘেরাও করে, সেদিন ঘেরাও তুলতে কর্তৃপক্ষ পুলিশ ডাকেন। পুলিশ অধ্যক্ষ সহ অধ্যাপক-অধ্যাপিকাদের ঘেরাও মুক্ত করার পর সন্ধ্যার অন্ধকারে ছাত্রীদের উপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। এর প্রতিবাদে ছাত্রী সংসদের নেতৃত্বে হাজরা মোড় অবরোধ করে ছাত্রী ও অভিভাবকরা। কলকাতা পুলিশের ডি সি সাউথ ছাত্রীদের কাছে এই ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইলে অবরোধ তুলে নেওয়া হয়। সেখানে উপস্থিত কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি ছাত্রীদের অভিযোগ শুনে পরের দিন তাঁকে বিষয়টি লিখিতভাবে জানাতে বলেন। ছাত্রী সংসদ ছাত্রীদের সমস্যাটি সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করার আবেদন জানিয়ে তাঁর কাছে একটি চিঠি দেয়। এর ভিত্তিতে তিনদিন বাদে কলেজ পরিচালন সমিতির সভা ডাকা হয়। এই তিনদিনের প্রতিদিনই ছাত্রীরা এবং তাদের অভিভাবকরা বহিরাগত ছেলেদের পরামর্শে উত্তেজিত হয়ে অন্যান্য কলেজের মতোই কলেজে ভাঙচুর করে সমস্যার সমাধান করতে চেয়েছে। কিন্তু ছাত্রী সংসদ দৃঢ়তার সাথে তা আটকেছে। কারণ ডি এস ও পরিচালিত ছাত্রী সংসদ ছাত্রীদের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও কোনও সময়েই শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের নিগ্রহ করার কথা চিন্তাও করেনি। এ তাদের আদর্শের পরিপন্থী। পরিচালন সমিতির সভার দিন কলেজ গেটে বহু বহিরাগত ভিড় জমায়। মিটিং-এ যখন ছাত্রীদের অ্যাপ্লিকেশন দিতে বলা হয়, তখন সেই সিদ্ধান্তকে না মেনে চটজলদি সমাধানের আশায় ঐ ছাত্রীদের পাশে নিয়ে বহিরাগতরা কলেজে হামলা চালায়। কলেজের নির্ধারিত সময় পার হয়ে যাওয়ার পর অধ্যক্ষা সহ কিছু অধ্যাপক এবং শিক্ষাকর্মী নিগৃহীত হন বলে সংবাদে প্রকাশ। খবর শুনে ছাত্রী সংসদের সদস্যরা তৎক্ষণাৎ অধ্যক্ষার কাছে লিখিতভাবে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে।

মুরলীধর গার্লস কলেজেও ছাত্রীদের একাংশ একইভাবে আন্দোলনে নামে। তারাও গভীর রাত পর্যন্ত অধ্যক্ষাকে ঘেরাও করে রাখে। শেষপর্যন্ত কলেজ কর্তৃপক্ষ পুলিশ দিয়ে পরিস্থিতির মোকাবিলা করে।

প্রশ্ন হল, ছাত্রছাত্রীরা এইরকম উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করছে কেন? কেনই বা অভিভাবকরাও তাতে সামিল হচ্ছেন? প্রতিটি সংবাদ মাধ্যম ছাত্রছাত্রীদের এই আচরণের বিরুদ্ধে বলেছে। তাদের দাবি অন্যায্য, একথাও বারবার প্রচারিত হয়েছে। পাশাপাশি অল ইন্ডিয়া ডি এস ও'র মতো ছাত্র সংগঠন কীভাবে এদের পাশে দাঁড়াতে পারে, সেই প্রশ্নও তোলা হয়েছে। কিন্তু আসল সমস্যাটিকে সংবাদ মাধ্যমও এড়িয়ে গিয়েছে। কেন আজ ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করতে চাইছে না? কী তাদের অসুবিধা? ইতিপূর্বে কলেজে ক্লাসে ছাত্রদের বাধ্যতামূলক উপস্থিতির হার নিয়ে এত বাড়াবাড়ি দেখা যায়নি। বহুদিন পর্যন্ত যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে এমন কোনও নিয়ম ছিল না। আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ৬০ শতাংশর নিচে উপস্থিতির হার থাকলে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয় না এবং ৭৫ শতাংশর মধ্যে থাকলে নন্ কলেজিয়েট করে ছাত্রদের কাছ থেকে ফাইন নিয়ে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়। কিন্তু এই নিয়ম কলেজগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগ করত না। ডিস-কলেজিয়েট ছাত্রদেরও পার্সেন্টেজ দিয়ে নন- কলেজিয়েট করে কলেজ ফাইন আদায় করত। ফ্রন্ট সরকারের জমানায় অনেক কলেজ কর্তৃপক্ষই বেশি পরিমাণে ফাইন নিয়ে কলেজের আয় বাড়ানোর একটা উপায় হিসাবেও দেখেছিল এই নিয়মকে। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সব জেনেও নীরব থেকেছে। তাহলে নিয়ম থাকা সত্ত্বেও এতদিন কর্তৃপক্ষ তা প্রয়োগ না করে, হঠাৎ এখন তৎপর হল কেন? আসলে কলেজে কলেজে ক্লাসে ছাত্রছাত্রীদের অনুপস্থিতির হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে অধুনা গুরুতর আকার ধারণ করেছে। কিছুকাল ধরে তাই কর্তৃপক্ষদের মুখে ছাত্রদের 'কলেজমুখী করার উপায়' নিয়ে ভাবনা শোনা গিয়েছে। সম্ভবতঃ তারই সূত্র ধরে এবার ঢালাও ডিস-কলেজিয়েট করে ছাত্রছাত্রীদের শাস্তি দেওয়ার ধুম পড়ে গেল। বলা বাহুল্য, এই পদক্ষেপ ব্যর্থ হতে বাধ্য। কারণ, কলেজে ক্লাস না করার পিছনে মূল কারণের প্রতিকারের চেষ্টা না করে আমলাতান্ত্রিক উপায়ে কোনও সমস্যার সমাধান হতে পারে না। অধিকাংশ কলেজে খোঁজ নিলেই জানা যাবে, ছাত্রছাত্রীরা ক্লাস করার আকর্ষণই বোধ করে না। পড়াশুনার পরিবেশ না থাকা, পরিকাঠামোর অভাব, শিক্ষকের অভাব, যোগ্য শিক্ষক না থাকা, ছাত্রদের সমস্যার প্রতি ন্যূনতম সহানুভূতির অভাব, অধ্যাপক থেকে উপাচার্য নিয়োগে দলবাজি প্রভৃতি বহু কারণ মিলে অবস্থা আজ যথার্থই ভয়াবহ।

এর সাথে যুক্ত হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পরীক্ষা পদ্ধতি, সিলেবাস নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পার্ট ওয়ান, পার্ট টু, পার্ট থ্রি পরীক্ষা এবং টেস্ট পরীক্ষার জন্য বছরের মধ্যে প্রায় ৯ মাস ক্লাস বন্ধ থাকে। তিন থেকে ৪ মাস ছাত্রদের ক্লাস হয়। ফলে পড়াশোনা বা ক্লাস করার কোনও ধারাবাহিক অভ্যাস ছাত্রদের গড়ে ওঠে না। ক্লাস টেস্ট, সেমেস্টার ইত্যাদি পরীক্ষার কারণে এই ক'মাসের মধ্যেও বেশ কিছুদিন ক্লাস হয় না।

ফলে নানাবিধ কারণে, যার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রধানত দায়ী, ছাত্ররা ক্লাস করার আকর্ষণই বোধ করে না। এছাড়াও বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে ছাত্রছাত্রীরা টিউশন নির্ভর হয়ে পড়েছে। শুধুমাত্র কলেজের পড়াশুনার উপর ভিত্তি করে আজ আর কেউ পরীক্ষা দেয় না। ফলে ক্লাস করার আগ্রহও কমছে।

এমতাবস্থায় শিক্ষাগ্রহণের চূড়ান্ত বিরুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে শুধুমাত্র নিয়ম করে, বা যে কলেজ সেই নিয়ম মানছে তাদের বাহবা দিয়েই কাজ সারছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এ রাজ্যে দীর্ঘ ৩২ বছর ক্ষমতায় আছে সিপিএম ফ্রন্ট সরকার। চূড়ান্ত দলবাজিতে শাসকদলের সমর্থক বা কর্মীরাই উপাচার্য, সহ-উপাচার্য, অধ্যক্ষ থেকে শুরু করে বহু পোস্টে নিযুক্ত হচ্ছেন। শিক্ষক বা কর্মচারীদের ক্ষেত্রেও একথা সত্য। ফলে নিয়ম তৈরি করা, তা মানা বা না মানা, সবই হয় এদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নির্দেশে। এতদিন ধরে এবং এই বছরও বেশিরভাগ কলেজেই এই নিয়মের তোয়াক্কা না করে ছাত্রদের পার্সেন্টেজ এবং পরীক্ষার নম্বর গ্রেস দিয়ে সকলকে পরীক্ষায় বসার অনুমতি দিয়ে দিয়েছে। সেইসব কলেজের ছাত্র সংসদে দেখা যাচ্ছে শাসক দলেরই ছাত্র সংগঠন, অধ্যক্ষ বা পরিচালন পর্ষদেও শাসক দলের অনুগতদেরই ভিড়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সব জেনেও না জানার ভান করে আছে। তাই এদের সদিচ্ছা নিয়েই প্রশ্ন ওঠে।

আরও একটি বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। যোগমায়া দেবী কলেজ এবং মুরলীধর গার্লস কলেজে ছাত্রী সংসদ এ আই ডি এস ও দ্বারা পরিচালিত। এই দু'টি কলেজে ছাত্রীদের আন্দোলন এবং তাদের দাবি মানা ও না-মানার পিছনে সাধারণের বাইরেও কিছু কারণ কাজ করেছে। দেশবন্ধু বা সিটি কলেজ কর্তৃপক্ষকে পার্সেন্টেজের নিয়ম শিথিল করতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোনও বাধা দেয়নি। কিন্তু যোগমায়া বা মুরলীধরে যাতে কিছুতেই এই নিয়ম শিথিল করা না হয়, তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, ইউ জি কাউন্সিল, প্রিন্সিপালস্ অ্যাসোসিয়েশন, যেগুলিতে শাসক দলেরই প্রাধান্য, তারা প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছে। অন্য দুটি কলেজের ঘেরাও-এর ঘটনায় বা বিভিন্ন কলেজ যখন চোখ বুঁজে সমস্ত ছাত্রদের ঢালাও নম্বর এবং পার্সেন্টেজ দিয়ে ফর্ম ফিল-আপ করার সুযোগ করে দেয়, তখন কোনও কথা না বললেও যোগমায়া দেবী ও মুরলীধরে ঘেরাও-এর পরপরই তড়িঘড়ি কলেজ অধ্যক্ষদের মিটিং ডেকে যাতে কিছুতেই এই দুই কলেজে ছাত্রীদের দাবি মানা না হয়, তার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কাউন্সিলও মিটিং করে এই সিদ্ধান্ত নেয়। অধ্যাপকদের সংগঠন ওয়েবকুটাও তৎপর হয়ে ওঠে। মুরলীধর গার্লস কলেজের অধ্যক্ষাকে এঁরা ঘেরাও মুক্ত করতে পৌঁছে যায়। কিন্তু দেশবন্ধু কলেজ বা সিটি কলেজে এই তৎপরতা দেখা যায়নি। শুধু তাই নয়, যোগমায়া দেবী কলেজের ও মুরলীধর কলেজের ছাত্রীরা প্রতিকার চেয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্যের কাছে ফোন করলে, তাদের বলা হয়, স্থানীয় সিপিএম অফিসে, না হয় এস এফ আই নেতাদের সাথে যোগাযোগ করতে। এই নগ্ন ও নোংরা দলবাজিই প্রমাণ করে দেয়, এই দুটি কলেজে ছাত্র সংসদ যদি সিপিএমের হাতে থাকত, তাহলে কর্তৃপক্ষ এহেন 'কঠোর' মনোভাব দেখাত না। সংবাদ মাধ্যমও কলেজগুলোয় পড়াশুনোর দুরবস্থার কথা না লিখে, কলেজে না আসার দায় কেবলমাত্র ছাত্রছাত্রীদের উপর চাপিয়ে দিয়ে তাদের দাবি কত অন্যায্য, তা প্রমাণ করতে উঠে পড়ে লেগেছিল। ফলে সামগ্রিক এক চক্রান্তের শিকার হয় এই দুটি কলেজের ছাত্রীরা।

বস্তুত, সিপিএম পরিচালিত ফ্রন্ট সরকারের আমলে শিক্ষাক্ষেত্রে যে দুর্নীতি, দলবাজি, নীতিহীনতা চরম অবস্থায় পৌঁছেছে, যার ফলে শিক্ষায় পশ্চিমবঙ্গের স্থান আজ তলানিতে, তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে এ রাজ্যের ছাত্রছাত্রীদেরই। শিক্ষার সিলেবাস, পরীক্ষা ব্যবস্থা, পরিকাঠামো সমস্ত কিছুই তাদের শিক্ষাগ্রহণের পরিপন্থী। শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীদের উচ্ছৃঙ্খলতা, শিক্ষকনিগ্রহ অবশ্যই অত্যন্ত নিন্দনীয়। কিন্তু শিক্ষার পরিবেশ এবং প্রকৃত শিক্ষাদান থেকে ছাত্রছাত্রীদের বঞ্চিত করার জন্য যে সরকার এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ দায়ী, তাদের বিরুদ্ধে প্রতিটি শিক্ষানুরাগী শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষকে আজ সোচ্চার হতে হবে।

**জলপাইগুড়ি**

## ডোনেশন আদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলনের জয়

জলপাইগুড়ি জেলার ময়নাগুড়ি ব্লকের তিনটি স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তির সময় বেআইনি ডোনেশন আদায়ের বিরুদ্ধে ছাত্র ও অভিভাবকদের আন্দোলন জয়যুক্ত হয়েছে। টেকাটুলি রামকান্ত হাইস্কুলে ২০ টাকা করে ডোনেশন আদায়ের বিরুদ্ধে অভিভাবকরা ডেপুটেশন দিলে প্রধান শিক্ষক ডোনেশন প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করেন। ফলে ১৩ মে থেকে ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়। ৫ দিন ধর্মঘটের পর কর্তৃপক্ষ ডোনেশন প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করেন। পুটিমারি মথুরামোহন হাইস্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে ৬০ টাকা ও অন্যান্য শ্রেণীতে ২০ টাকা করে ডোনেশন আদায়ের বিরুদ্ধেও ছাত্র ও অভিভাবকদের আন্দোলন গড়ে ওঠে। এখানেও ২ দিন ধর্মঘট চলে। পরে অভিভাবকদের সঙ্গে এক সভায় কর্তৃপক্ষ ওই ডোনেশন আদায় বন্ধ করার কথা এবং আদায়ীকৃত টাকা ফেরৎ দেওয়ার কথা ঘোষণা করেন।

হেলাপাকড়ি পদমতি ইউনিয়ন রহিমুদ্দিন উচ্চ বিদ্যালয়ে এ আই ডি এস ও-র আন্দোলনে পঞ্চম শ্রেণীতে ১৩৫ টাকা, অন্যান্য শ্রেণীতে ১০০ টাকা বেআইনি আদায় বন্ধ হয়। এ আই ডি এস ও-র জেলা সম্পাদক কমরেড তপন রায় এই জয়ের জন্য ছাত্র ও অভিভাবকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

# পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র এখন মানি-পাওয়ারের উপর দাঁড়িয়ে

একের পাতার পর

ফল পুঁজিপতিরা প্রত্যাশা করেছিল এবং তাদের প্রত্যাশা মতোই ফল হয়েছে।

নির্বাচনের প্রাক্কালে গণদাবীর ৬১ বর্ষ ৩৩ সংখ্যায় এক প্রতিবেদনে আমরা দেখিয়েছিলাম, মানি পাওয়ার পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের মূল চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করছে। আমরা দেখিয়েছিলাম, সংসদীয় দলগুলি নির্বাচনে যে কোটি কোটি টাকা খরচ করে, এই টাকার যোগানদার দেশের বিভিন্ন পুঁজিপতি গোষ্ঠী। মুম্বইয়ের এক পত্রিকা দেখিয়েছে, ২০০৩-২০০৭ সালের মধ্যে কংগ্রেস ও বিজেপি কোন গোষ্ঠীর কাছ থেকে কী পরিমাণ টাকা নিয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, রাখঢাক করে দেওয়া হিসাবেও কংগ্রেসকে আদিত্য বিড়লা গ্রুপ দিয়েছে ২১ কোটি ৭১ লক্ষ টাকা, টাটারা দিয়েছে ৪.৩২ কোটি, ভিডিওকন দিয়েছে ৪.৫০ কোটি, লারসেন টুব্রো দিয়েছে ১ কোটি, বাজাজ দিয়েছে ১ কোটি টাকা। বিজেপিকেও তারা দিয়েছে। বিজেপিকে বিড়লা গ্রুপ দিয়েছে ২.৯৬ কোটি, ভিডিওকন দিয়েছে ৩.৫০ কোটি, স্টার লাইট দিয়েছে ১০ কোটি, লারসেন টুবরো দিয়েছে ১ কোটি, বাজাজ দিয়েছে ১ কোটি টাকা। এবারের নির্বাচনে কংগ্রেসের জয়ে যে পুঁজিপতিশ্রেণী প্রবলভাবে উল্লসিত, তারা তাদের প্রত্যাশা মতো নির্বাচনী ফলাফল পাওয়ার জন্য কোটি কোটি টাকা এই দলকে দিয়েছে এবং কংগ্রেসের পক্ষে প্রচার চালিয়ে গেছে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল ম্যানেজারের মতো পুঁজিপতিদের দরকার পলিটিক্যাল ম্যানেজার, যারা তাদের অনুকূলে নানা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, নীতি নির্ধারণ করবে। এই কারণে পুঁজিপতিরা তাদের পছন্দমতো সরকার গঠনে সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

ইউ পি এ সরকারকে দিয়ে পুঁজিপতিশ্রেণী কী কী কাজ করিয়ে নিতে চায়, নির্বাচনের পরই তা সরকারকে তারা জানিয়ে দিয়েছে। পুঁজিপতিরা চাইছে, নতুন সরকার অর্থনৈতিক সংস্কারের কাজগুলি দ্রুত সম্পন্ন করুক, পেনশন বিল, বিমা বিল দ্রুত পাশ করিয়ে নিক। তারা চাইছে, খুচরো ব্যবসায় বিদেশি বিনিয়োগের জন্য যাবতীয় কাজগুলি সরকার দ্রুত করুক। তারা চাইছে, শ্রমশিল্পে আরও সংস্কার — যার অর্থ শ্রমিক-কর্মচারীদের অধিকারগুলি আরও হরণ করা এবং মালিকদের আরও শোষণের পথ করে দেওয়া। তথ্যপ্রযুক্তির মালিকরা সরকারকে বলেছে, দ্বিতীয় ও তৃতীয় সারির শহরগুলিতে তথ্যপ্রযুক্তির প্রসারের জন্য আরও অধিক পরিমাণে বিনিয়োগ করা হোক। তারা চাইছে, এই সরকার 'প্রাইভেট - পাবলিক পার্টনারশিপ' নীতি নিয়ে চলুক। পুঁজিপতিরা চাইছে অর্থনীতিতে মন্দা কাটাতে সরকার তাদের আরও 'স্টিমুলাস প্যাকেজ' দিক। পুঁজিপতিদের দেওয়া চাহিদা তালিকায় আরও বহু বিষয় রয়েছে, তবে যে কয়েকটি বিষয় সংবাদমাধ্যমে এসেছে, তাতে এটা স্পষ্ট যে, এই পদক্ষেপ সাধারণ মানুষকে আরও আর্থিক সমস্যায় ফেলবে। ফলে যে বিপুল সংখ্যক সাধারণ মানুষ এই নতুন সরকারকে ভোট দিলেন, সরকার এই সমস্ত সংস্কারগুলি সম্পন্ন করে কি সেই জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না?

নতুন সরকারে কার কী মন্ত্রী হওয়া উচিত, তা নিয়েও পুঁজিপতিরা কলকাঠি নাড়া শুরু করে দিয়েছে। বলা হয়, 'পার্লামেন্ট আম আদমির'। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে আসল নিয়ন্ত্রক পুঁজিপতিরা। মুরলী দেওরাকে পেট্রলিয়াম মন্ত্রী হিসাবে পুনরায় দেখতে চায় এক বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থা। কারণ তারা মুরলী দেওরার আমলে, পেট্রল-ডিজেলের দাম ক্রমাগত বাড়িয়ে বিপুল মুনাফা করেছে। সংবাদে প্রকাশ, টেলিকম মন্ত্রক নিয়ে সি ডি এম এ এবং জি এস এস লবির মধ্যে বিরোধ রয়েছে। সি ডি এম এ চায় টেলিকম মন্ত্রকে ডি এম কে'র এ রাজাই থাকুক। আর দ্বিতীয় লবি চাইছে, কংগ্রেসেরই কেউ হোক। এই নজিরগুলি দেখিয়ে দেয়, কোটিপতি এম পিরা কে কোন পুঁজিপতিগোষ্ঠীর পছন্দের এবং কোন এম পিরা আসলে কাদের লোক। পুঁজিপতিরা এইসব এমপিদের মাধ্যমে সংসদে তাদের স্বার্থের অনুকূলে বিভিন্ন নীতি পাশ করিয়ে নেয়। এই অবস্থায় বুর্জোয়া পার্লামেন্ট থেকে সাধারণ মানুষ কি বিরাট কিছু আশা করতে পারেন?

কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন, এই পার্লামেন্টেই তো গ্রামীণ খেতমজুরদের জন্য ১০০ দিনের কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন পাশ হয়েছে। এই পার্লামেন্টেই পাশ হয়েছে, বনাঞ্চলে আদিবাসীদের বসবাসের আইন। এখানেই পাশ হয়েছে, অসংগঠিত শ্রমিকদের স্বার্থে সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প। তাহলে এই বুর্জোয়া পার্লামেন্ট থেকে কি সাধারণ মানুষের আশা করার কিছু নেই? তাদের ঢুকতে হবে সমস্যার আরও গভীরে। ভাবতে হবে, কেন কর্মসংস্থানের জন্য 'আইনি গ্যারান্টি'ই দিতে হয়, কেন পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সকলের কর্মসংস্থান হয় না, কেন পুঁজিবাদে শিল্পে লালবাতি জ্বলে, কেন শিল্পের অপ্রতিহত বিকাশ আজ আর পুঁজিবাদে হয় না এবং বেকারত্ব চূড়ান্ত রূপ নেয়। এগুলির কারণ খুঁটিয়ে বিচার করলে বুঝতে অসুবিধা হয় না, আসলে কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন তীব্র বেকার সমস্যায় জর্জরিত মানুষের ক্ষোভ একটু প্রশমিত করারই দাওয়াই। সকলের সারা বছরের কাজ দূরের কথা, এমনকী ন্যূনতম ১০০ দিনের কাজ থাকলেও তার গ্যারান্টি দিতে হবে কেন? তাছাড়া ১০০ দিনের কর্মসংস্থান গ্যারান্টি আইন তো হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে ১৫/২০ দিনের বেশি কাজ দেওয়া হয়নি এবং সকল বিপিএলভুক্তকেও দেওয়া হয়নি। একইভাবে বৃহৎ পুঁজিপতিদের স্বার্থে বনাঞ্চল থেকে সেখানকার অধিবাসীদের উচ্ছেদ করার ফলে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, তা প্রশমিত করার লক্ষ্যেই করা হয়েছে বনাঞ্চল আইন। তাই দেখা যাচ্ছে, এই আইনে সামান্য যতটুকু অধিকার দেওয়া হয়েছে, বাস্তবে তাকে কার্যকর করার কোনও সরকারি উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে না। তাছাড়া, সীমাহীন মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, ছাঁটাই, শিক্ষা ও চিকিৎসার সুযোগ ক্রমেই সংকুচিত হওয়া — এসব না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। তাহলে পার্লামেন্ট কী দিচ্ছে সাধারণ মানুষকে? পার্লামেন্ট দিচ্ছে কেবল পুঁজিপতিদেরকেই। সেই কারণে, যখন বলা হয়, পার্লামেন্টারি শাসন 'জনগণের দ্বারা, জনগণের জন্য, জনগণের শাসনের' নামে আসলে 'পুঁজিপতিদের দ্বারা, পুঁজিপতিদের জন্য, পুঁজিপতিদের শাসন', তখন এ কথার মধ্যে কোথাও এতটুকু অর্থের বিকৃতি ঘটে না।

আজও বহু মানুষ মনে করেন, ভাল লোক, সৎ লোক পার্লামেন্টে গেলে জনগণের স্বার্থে তিনি কিছু করতে পারেন। এম পি ল্যাডের টাকায় রাস্তা নির্মাণ, স্কুলে অনুদান, কিছু কিছু প্রকল্পে দানখয়রাতি — এই জাতীয় কিছু কাজ নিঃসন্দেহে তিনি করতে পারেন। কিন্তু এগুলো তো জনগণেরই টাকা, জনগণের টাকায় জনগণের জন্য খরচ করার কিছু দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে। তাই দিয়ে তিনি দাতা সাজেন। কিন্তু যেগুলি মানুষের মৌলিক সমস্যা, অর্থাৎ, দারিদ্র-বেকারত্ব, তীব্র অর্থনৈতিক সংকট থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি, এই সংসদীয় ব্যবস্থায় কোন সাংসদের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব নয়। কারণ দারিদ্র, বেকারত্ব যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ফসল, সেই পুঁজিবাদকেই রক্ষণাবেক্ষণ করে প্রচলিত সংসদীয় ব্যবস্থা।

ভারতের সংসদীয় ব্যবস্থা আজ আর শিশু নয়। তার বয়স ৬২ বছর। এই ৬২ বছরের ইতিহাস কী? সংসদীয় ব্যবস্থা কি যথার্থই জনজীবনের সমস্যা দূর করতে পারে? যদি পারে, তা হলে মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক সংকট এত তীব্র কেন? কারা লাভবান হচ্ছে সংসদীয় ব্যবস্থা থেকে? লাভবান হচ্ছে পুঁজিপতিরা, আর যারা পুঁজিবাদের গোলামি করে চলেছে তারা।

২০০৪ সালে লোকসভা নির্বাচনের সময় অন্ধ্রপ্রদেশের বিজয়ওয়াড়ার কংগ্রেস এমপি'র ঘোষিত সম্পত্তির পরিমাণ ছিল ৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা। পাঁচ বছরের মাথায় সেই সম্পত্তির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৯৯ কোটি টাকায়। অর্থাৎ পাঁচ বছর দেশসেবা করার পর নিজস্ব সম্পত্তি ৩০ গুণ বেড়েছে। অন্যদিকে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ যে তিমিরে ছিল, তার থেকে আরও গভীর অন্ধকারে তলিয়ে গেছে।

# পেট্রোডলারের আধিপত্য আজ আবার চ্যালেঞ্জের মুখে

আমেরিকার ইরাক আক্রমণের প্রকৃত কারণ কী? তা কি তথাকথিত 'সন্ত্রাসবাদে মদত দান, পারমাণবিক ও অন্যান্য গণবিধ্বংসী অস্ত্র মজুত করা' ইত্যাদি অভিযোগ তুলে ইরাকের তেলের প্রতি নিজেদের উদগ্র লোভ চরিতার্থ করা? নাকি পেছনে আছে আরও গূঢ় কারণ? অন্তত সাম্প্রতিক অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ সেরকমই ইঙ্গিত করে।

আমেরিকার অর্থনীতির আজ সবচেয়ে বড় শক্তিই হল, বিশ্ববাণিজ্যে ডলারের মজবুত অবস্থান। তৈলবাণিজ্য সহ আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের বৃহদংশেরই লেনদেন হয় ডলারে। পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে যেকোনও দেশের মুদ্রার বিনিময় মূল্য একদা নির্ধারিত হত সেই মুদ্রার পিছনে কত সোনা সঞ্চিত আছে তার উপর নির্ভর করে। মার্কিন সরকার প্রতিশ্রুতি দিত, ৩৫ ডলারের বদলে যে কোনও সময়ে সে ১ আউন্স (২৮.৩৪ গ্রাম) সোনা দেবে। কিন্তু ১৯৭১ সাল নাগাদ নিজেদের অর্থনৈতিক মন্দা সামাল দিতে আমেরিকা তার সঞ্চিত সোনার তুলনায় বহু গুণ ডলারের নোট ছাপিয়ে তা বাজারে ছাড়তে শুরু করে। বিষয়টি প্রথমে গোপন ছিল। কিন্তু কয়েক বছর পর ফরাসি সরকার তাদের হাতে মজুত ডলারের বদলে আমেরিকার কাছ থেকে তার সমমূল্যের প্রতিশ্রুত সোনা দাবি করলে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ প্রমাদ গুনতে শুরু করে। কারণ, ঐ পরিমাণ সোনা তখন তাদের সঞ্চিতই ছিল না। কিন্তু বিষয়টি প্রকাশ্যে আনাও মুশকিল। তাহলে দেশের গোটা অর্থনীতিকেই দেউলিয়া ঘোষণা করতে হয়।

এই সঙ্কট থেকে উদ্ধার পেতে আমেরিকা এই সময় থেকেই তাদের প্রভাবাধীন তৈল উৎপাদক আরব দেশগুলির উপর নিজেদের প্রভাব খাটাতে শুরু করে। একটা চুক্তি হয় — যার ফলে তখন থেকে তৈল উৎপাদক দেশগুলির সংস্থা 'ওপেক' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, এখন থেকে আন্তর্জাতিক তৈলবাণিজ্যের লেনদেন একমাত্র ডলারে হবে। এইভাবেই পেট্রোডলারের জন্ম হয়।

এই পেট্রোডলার মার্কিন সাম্রাজ্যবাদকে এক বিরাট শক্তির জোগান দেয়। কারণ, তখন থেকেই অবস্থাটা দাঁড়ায় এমন যে, কোনও দেশ যদি তেল কিনতে চায়, তবে তাকে আগে বিপুল পরিমাণ মার্কিন ডলার সঞ্চয় করতে হবে। কারণ, একমাত্র তার বিনিময়েই সে তার প্রয়োজনীয় তেল কিনতে সক্ষম হবে। আবার তেল বেচবে যে দেশগুলি তারাও ডলার রাখবে মার্কিন ব্যাঙ্কে। কাজেই ডলারের বদলে সোনা চাইবে না কেউ।

তেল কেনার টানে বিশ্বজুড়েই বিভিন্ন দেশের কাছে ডলারের একটা কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি হয়। সেই চাহিদা মেটাতে সেইসব দেশও তাদের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যে ডলারের ব্যবহার শুরু করে। এইভাবে ফাঁপাই ডলার, পেছনে সঞ্চিত প্রয়োজনীয় পরিমাণ সোনা ছাড়াই, সারা বিশ্ব জুড়ে মজবুত মুদ্রার স্বীকৃতি লাভ করতে সক্ষম হয়। অথচ, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তার জন্য একমাত্র নোট ছাপানো ছাড়া আর কোনও খরচই করতে হয়নি।

এর ফল দাঁড়ায় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে খুবই অনুকূল। কারণ, আমেরিকা আন্তর্জাতিক তৈলবাণিজ্যে সবচেয়ে বড় ক্রেতা। কিন্তু সে তার প্রয়োজনীয় তেল বাজার থেকে শুধুমাত্র নোট ছাপিয়ে, অর্থাৎ বাস্তবে বিনামূল্যে সংগ্রহ করতে শুরু করে। বাকি সারা বিশ্ব তাদের ডলার সংগ্রহ করার চাহিদা থেকে ডলারের বিনিময়ে পণ্য রপ্তানি করতে সেই বিপুল খরচ বহন করতে বাধ্য হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন গঠন ও বাণিজ্যের মাধ্যম হিসাবে ইউরো আসে তার পর। সাদ্দাম হোসেনের ইরাক ওপেকের সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে সরাসরি ইউরোতে তাদের তেল বিক্রি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এর ফলে পেট্রোডলার সাম্রাজ্য এক ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদও বুঝতে পারে, তার অর্থনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখতে গেলে এখনই সাদ্দাম হোসেনকে থামানো দরকার। কিন্তু কী ভাবে? সামনে নিয়ে আসা হয় সন্ত্রাসবাদ ও গণবিধ্বংসী অস্ত্র তৈরি ও মজুত করার অভিযোগ (দুটি অভিযোগই ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ অসত্য প্রমাণিত)। তারপর ইরাক আক্রান্ত হয়। শুরু হয় মৃত্যুর দীর্ঘ মিছিল, যা আজও বহমান। সে দেশ দখল করে সাদ্দামকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দিয়েই আমেরিকার প্রথম কাজই হয় ইরাকের তেল রপ্তানির ক্ষেত্রে পুরনো ডলারনির্ভর ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। এইভাবে সেই মুহূর্তে আমেরিকার পক্ষে মুদ্রাসঙ্কটকে সামাল দেওয়া সম্ভব হয়।

কিন্তু সমগ্র আন্তর্জাতিক তৈল বাণিজ্যে আবার আগের মতো পেট্রোডলারের নিয়ন্ত্রণে ফিরিয়ে আনা আজ যথেষ্ট মুশকিল। ভেনেজুয়েলার রাষ্ট্রপতি হুগো স্যাভেজ ইতিমধ্যেই অন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং ভেনেজুয়েলায় উৎপন্ন তেল আজ বিশ্ববাজারে ডলার ছাড়া অন্যান্য মুদ্রার বিনিময়েও বিক্রি হচ্ছে। ইরানও একই পথ বেছে নিয়েছে। ফলে পেট্রোডলারের প্রশ্নাতীত আধিপত্য আজ আবার চ্যালেঞ্জের মুখে। বিশ্বজুড়ে সাম্প্রতিক ডলারের মূল্যমান হ্রাসও মার্কিন অর্থনীতিতে এতবড় ধসের পেছনে একটা অন্যতম বড় কারণ। অবস্থা সামাল দিতে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ অবশ্য চেষ্টার কোনও কসুর করছে না। ইরান ও ভেনেজুয়েলা উভয় দেশকেই নানা অজুহাত তুলে ক্রমাগত আক্রমণের হুমকির সামনে রাখা হয়েছে। আর তা না করে আমেরিকার আজ আর কোনও উপায় নেই। যুদ্ধ বাধিয়ে ও গায়ের জোরে নিজের সুবিধা মতো ব্যবস্থা অন্যদের উপর চাপিয়ে দিতে না পারলে তার অর্থনীতিতে ধস আজ আর কোনওভাবেই ঠেকানো সম্ভব নয়। পেট্রোডলারের পতনে সেই অবস্থারই সম্মুখীন হয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আজ আবার নতুন যুদ্ধের ফিকির খুঁজতে ব্যস্ত। যুদ্ধই তার শেষ অস্ত্র। নতুবা শুধুমাত্র কাগজের ডলার ছাপিয়ে তৈলবাণিজ্যের ওপর নিজ আধিপত্য বজায় রেখে সারা বিশ্ব অর্থনীতির উপর ছড়ি ঘোরানোর সুখের দিন আবার ফিরিয়ে আনা খুবই কঠিন।

# ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গে

ভারত ও চীন এশিয়ার দুই বৃহৎ দেশ। এই দুই দেশের মধ্যে সীমান্তবিরোধ দীর্ঘদিনের। কখনও গরম গরম কথা, কখনও কামান গর্জনের মধ্য দিয়ে সেই বিরোধ প্রকাশ পায়। ১৯৬২ সালে ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষ এখন ইতিহাসের বিষয়। ১৯৬২ সালের ২১ নভেম্বর মাঝরাতে যখন চীন একতরফাভাবে সেনা প্রত্যাহার করে, তখন দু'টি বিতর্কিত এলাকা চীনের দখলে থেকে যায়। এ প্রসঙ্গে আমরা পরে আসব। চীনের এই একতরফা যুদ্ধবিরতি ও সেনা প্রত্যাহার সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বিশ্বখ্যাত মানবতাবাদী দার্শনিক বার্ট্রান্ড রাসেল বলেন, শত্রু যখন বিপর্যস্ত, তেমন মুহূর্তে একতরফা যেভাবে যুদ্ধবিরতি ও সেনা প্রত্যাহার চীন করেছে, তা বিশ্বের ইতিহাসে নজিরবিহীন। এই পর্বে রাসেল একদিকে জওহরলাল নেহেরু ও অন্যদিকে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাই-এর সঙ্গে ধারাবাহিক চিঠিপত্র দিয়ে যুদ্ধ বন্ধের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এসময়ে উভয়পক্ষের মধ্যে কোনও লিখিত শান্তিচুক্তি হয়নি। এমনকী, স্বীকৃত সীমান্ত নির্ধারণ পর্যন্ত করা হয়নি। পরবর্তীকালে, ১৯৬৭ ও ১৯৮৪ সালে ছোটখাট কিছু সংঘর্ষ ছাড়া মোটামুটি শান্তি বজায় ছিল। বিগত বছর দশেক সীমান্তবিরোধ মিটিয়ে নেওয়ার জন্য দুই দেশই বার বার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। ১৯৯৩ ও ১৯৯৬ সালে দু-পক্ষই 'সিনো-ইন্ডিয়ান বাইল্যাটারাল পীস অ্যান্ড ট্রাঙ্কুইলিটি অ্যাকর্ড'-এ সই করে। এই চুক্তির উদ্দেশ্য ছিল, লাইন অব অ্যাকচুয়াল কন্ট্রোল (প্রকৃত সীমান্তরেখা) বরাবার শান্তি বজায় রাখা। অতি সম্প্রতি, কূটনৈতিক মহলে সীমান্ত বিতর্ক আবার মাথাচাড়া দিয়েছে। ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে চীনের রাষ্ট্রদূত সু-য়ু-সি বলেছিলেন, "পুরো অরুণাচল প্রদেশটাই চীন তার নিজের বলে দাবি করে।" এরপরই অভিযোগ ও পাল্টা অভিযোগ উঠতে থাকে দু'পক্ষ থেকেই। ভারতের বিদেশমন্ত্রীও মন্তব্য করতে ছাড়েননি। ফলে ১৯৯৩ ও ১৯৯৬ সালের চুক্তিকে ভিত্তি করে যে শান্তি বজায় ছিল, তাতে ফাটল ধরে। ২০০৭ সালে উত্তেজনা তুঙ্গে ওঠার পর, ২০০৮ সালে চীনের প্রধানমন্ত্রী হু-জিনতাও ভারতে আসার আগে, দু'দেশের বিশেষ প্রতিনিধিদের নিয়ে মিটিংয়ের প্রস্তাব ভারত দেয়। কিন্তু চীন তাতে সাড়া দেয়নি, যদিও চীনের রাষ্ট্রপতি ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী উভয়েই শান্তিপূর্ণ সমাধানের কথা বলছেন। এরপর ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের অরুণাচল প্রদেশ ভ্রমণের কর্মসূচিতে চীন কূটনৈতিক স্তরে আপত্তি জানায় এবং সেই আপত্তি প্রকাশ করে দেয়। এর প্রতিক্রিয়ায় ভারতের বিদেশমন্ত্রী অরুণাচলের ওপর ভারতের জোরদার দাবি জানায়। এরপর দু'পক্ষেই নরম-গরম বাদানুবাদ চলতে থাকে। বলাবাহুল্য, এসব ঘটনায় সীমান্ত এলাকায় উত্তেজনা বাড়তে থাকে এবং ঠাণ্ডা যুদ্ধের বাতাবরণ তৈরি হয়।

### গত শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকে তৈরি সীমান্ত বিরোধের দীর্ঘ ইতিহাস

ভারত ও চীনের মধ্যে সীমান্ত বিরোধের বর্তমান চেহারাটি গত শতকের পঞ্চাশের দশকেই রূপ নিয়েছিল। এই সীমান্ত বিরোধের ইতিহাস আরও প্রাচীন। ভারত বলতে যে দেশকে আজ আমরা বুঝি, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পদানত ব্রিটিশ ভারতে দুশো বছর ধরে তার সীমানা নির্ধারিত হয়েছে। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের মধ্য দিয়ে ভারতীয় বুর্জোয়াশ্রেণী রাষ্ট্রক্ষমতায় আসে ও সার্বভৌম পুঁজিবাদী ভারত রাষ্ট্রটি তৈরি করে। ১৯৪৯ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন গড়ে ওঠার আগে সুদীর্ঘকাল চীন ছিল আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্ততান্ত্রিক দেশ। সেই সুদীর্ঘ শাসনকালে চীনের শাসকরা, বিশেষত সুদূর সীমান্ত এলাকায় নানা ভূখণ্ড দখল করে এবং সেগুলিকে চীনের ঢিলেঢালা প্রশাসনিক কাঠামোর আওতায় নিয়ে আসে। বর্তমানে প্রতিবিপ্লবের মধ্য দিয়ে সমাজতান্ত্রিক চীন পুঁজিবাদে অধঃপতিত হয়েছে। কিন্তু গত শতাব্দীর মধ্যভাগে ভারত ও চীন, সাম্রাজ্যবাদের কবল থেকে বেরিয়ে এসে অতীতের কালিমা ঘুচিয়ে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহযোগিতা, শান্তির মধ্য দিয়ে উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিল। প্রতিবেশীসুলভ মৈত্রীর পরিমণ্ডলে সীমান্তবিরোধের আপস-মীমাংসা করতে চাইছিল। উভয় দেশই বিপুল উৎসাহে ১৯৫৬ সালের ১৭-২৫ এপ্রিল সিংহলের কলম্বোতে অনুষ্ঠিত বান্দুং শান্তি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিল। এই সম্মেলনের আয়োজক পাঁচটি দেশের অন্যতম ছিল ভারত। এই সম্মেলনে চীন সহ আরও ২৪টি সদ্য স্বাধীন আফ্রো-এশীয় দেশ যোগ দিয়েছিল। সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, 'পারস্পরিক বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসা ও জাতিগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান'। সেদিন সমাজতন্ত্রের অগ্রযাত্রার পথিক চীন প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে সীমান্ত বিরোধ মীমাংসার জন্য কিছু সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপের প্রস্তাব করেছিল। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন লাই বান্দুং সম্মেলনে এবং পরে অন্যত্র প্রস্তাবগুলি রেখেছিলেন। প্রথম প্রস্তাব ছিল, সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারকে সীমান্তের বিতর্কিত অংশগুলি চিহ্নিত করতে হবে ও খোলামেলা আলোচনার বিষয় করতে হবে। দ্বিতীয়ত, যেহেতু এই কাজে সময় লাগবে, তাই অন্তর্বর্তীকালে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে হবে — যার লক্ষ্য হল দু'দেশের সেনাবাহিনীর টহলদারীর সময়ে সংঘর্ষের ঘটনা এড়ানো। তৃতীয়ত, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সীমান্তরেখা ও সংশ্লিষ্ট সমস্ত সন্ধিচুক্তির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রতিবেশী দেশগুলি সন্তোষজনক সীমানা নির্ধারণের জন্য আলোচনায় এগিয়ে আসবে। চতুর্থত, সীমান্তরেখার কোন অংশগুলি নিয়ে বিরোধ নেই, তা নির্ধারণের জন্য উভয়পক্ষকে নিয়ে যুক্ত সীমান্ত কমিশন গঠন করা হবে। পঞ্চম ও সর্বশেষ, প্রতিটি বিতর্কিত অংশ সম্পর্কে নতুন এবং সামগ্রিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে তার ভিত্তিতে সীমান্ত বিরোধের নিষ্পত্তি ঘটানো হবে। এইসব সীমান্তবিরোধের বেশির-ভাগটাই এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলি উত্তরাধিকার হিসাবে পেয়েছে, তাদের পুরনো ঔপনিবেশিক বা সামন্তী শাসনের আমল থেকে। স্বাধীনতা পাওয়ার পর জনগণের শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধি ও প্রগতির স্বার্থে এইসব বিরোধের আশু মীমাংসা জরুরি ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে চীনের প্রস্তাবগুলি কেবল কথার কথা নয়, সুচিন্তিত অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ বলে প্রতিভাত হয়েছিল। অবশ্যই, সংশ্লিষ্ট দেশগুলির আপস-মীমাংসায় পৌঁছানর জন্য আরও বহু বিষয়কে যুক্ত করে আলোচনাকে প্রসারিত করা অবশ্যই প্রয়োজন ছিল। কিন্তু এসব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও, ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ মাথাচাড়া দেয় ও দ্রুত বাড়তে থাকে। কেবল সীমান্ত নিয়ে উত্তেজনা বাড়ে তাই নয়, ১৯৫৯ সালের আগস্টে সীমান্তে গুলিগোলা বিনিময় হয় ও ১৯৬২ সালে পুরোপুরি যুদ্ধ লেগে যায়।

এরপরও কেটে গেছে পঞ্চাশ বছরেরও বেশি। সমস্যাটি এখনও টিকে আছে শুধু নয়, মাঝে মাঝে বিপজ্জনক রূপ নিচ্ছে। আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ মীমাংসা তো দূর অস্ত্, সমস্যাকে জিইয়ে রাখা হচ্ছে। সীমান্ত বিরোধ নিয়ে বৈঠকের পর বৈঠক হচ্ছে, ফলাফল শূন্য। পরিণামে মীমাংসাই পিছিয়ে যাচ্ছে কেবল নয়; সাথে সাথে ক্রমাগত চাপাচাপির ফলে দু'দেশের জনগণের মধ্যেকার সম্প্রীতি ও সহযোগিতায় ক্ষয় ঘটছে। সর্বোপরি প্রতিবিপ্লব চীনে পুঁজিবাদ ফিরিয়ে এনেছে। ফলে ভারতের জনগণের সঙ্গে চীনের জনগণকেও পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের নির্মম শোষণ ও আক্রমণের সামনে পড়তে হচ্ছে। সীমান্ত বিরোধের আগুন চিরতরে নিভিয়ে দেওয়ার চেষ্টা না করে, দু'দেশের শাসকরাই আগুনে ঘি ঢালছে। কারণ সকলেই জানেন, জনজীবনের সমস্ত সমস্যার মূল কারণ যে শোষণমূলক পুঁজিবাদী শাসন, তা থেকে জনগণের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য পুঁজিবাদী শাসকরা যে উগ্র জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা উস্কে তুলতে চায়, অমীমাংসিত সীমান্ত বিরোধ সে ক্ষেত্রে তাদের বড় অবলম্বন।

তার ওপর, ভারতীয় পুঁজিবাদ ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাদী চরিত্র অর্জন করেছে শুধু নয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ এখন দক্ষিণ এশিয়ার আঞ্চলিক বৃহৎ শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য মরিয়া। দুনিয়া-জোড়া তীব্র পুঁজিবাদী বাজার সংকটের পরিপ্রেক্ষিতে, দক্ষিণ এশিয়ার বাজারে নিজস্ব আধিপত্য বিস্তারের জন্য ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ নানাভাবে চেষ্টা চালাচ্ছে। পুঁজিবাদী চীনের মধ্যেও সাম্রাজ্যবাদী বৃহৎ শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভের আকাঙ্ক্ষা সুপ্তভাবে রয়েছে এবং চীন সেদিকে দ্রুত এগোচ্ছে। এশিয়ার বাজারে নিজস্ব দখলদারী নিশ্চিত করা এবং নিজস্ব প্রভাবাধীন অঞ্চল তৈরির সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা থেকে চীনও মুক্ত নয়। অন্যদিকে, বৃহৎ শক্তি হিসাবে চীনের মাথাচাড়া দেওয়ার ঘটনাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ আশঙ্কা ও সন্দেহের চোখেই দেখছে। বিশ্ব পুঁজিবাদী সংকটের পটভূমিতে পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মধ্যে এই দ্বন্দ্ব চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধের ওপর ছায়া ফেলতে পারে। এটা খুবই সম্ভব যে, ষড়যন্ত্র ও হস্তক্ষেপের কাজে দক্ষতার জন্য কুখ্যাত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ, এই সুযোগে ভারতকে উত্তেজিত করবে এবং চীনের বেড়ে ওঠায় লাগাম পরাতে চীন-ভারত দ্বন্দ্বকে কাজে লাগাবে।

> জনজীবনের সমস্ত সমস্যার মূল কারণ যে শোষণমূলক পুঁজিবাদী শাসন, তা থেকে জনগণের দৃষ্টিকে ঘুরিয়ে দেওয়ার জন্য পুঁজিবাদী শাসকরা যে উগ্র জাতীয়তাবাদী উন্মাদনা উস্কে তুলতে চায়, অমীমাংসিত সীমান্ত বিরোধ সে ক্ষেত্রে তাদের বড় অবলম্বন।

এই পরিস্থিতিতে, চীন ও ভারত দু'দেশের জনগণকেই, নিজ নিজ প্রয়োজন থেকেই সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা ত্বরান্বিত করার জন্য অগ্রণী হতে হবে। এই সমস্যার সমাধান যেহেতু একমাত্র আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শের ভিত্তিতেই হতে পারে, তাই ভারতের জনগণকে যেমন পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, চীনের জনগণকেও তাঁদের দেশের পুঁজিবাদকে খতম করে পুনরায় সমাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার সংগ্রাম নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। এই প্রয়োজন থেকে সর্বাগ্রে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী আদর্শের ভিত্তিতে উভয় দেশের জনগণের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। সাথে সাথে ভারতের জনগণকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে সীমান্তবিরোধকে কাজে লাগিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তৈরি ফাঁদে ভারত সরকার না পা দেয়। সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সুদৃঢ় বনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে ভারত ও চীনের জনগণকে নিজ নিজ দেশের সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে, যাতে তারা যত শীঘ্র সম্ভব আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধান করে। এই জন্য দরকার সীমান্ত বিরোধ সৃষ্টির বিশদ ইতিহাসটি ভালো করে জানা।

পাকিস্তান থেকে বর্মা পর্যন্ত হিমালয় পর্বত ধরে চার হাজার কিলোমিটার ভারত-চীন সীমান্তের কয়েকটি বিশেষ এলাকা জুড়ে বিরোধ রয়েছে। পশ্চিম দিকে ইউরোপের সুইজারল্যান্ডের আকারের আকসাই চীনকে নিয়ে বিরোধ রয়েছে। তিব্বত ও সিনকিয়াং প্রদেশের মাঝখানে রয়েছে আকসাই চীন। এর একপ্রান্তে ভারতের জম্মু ও কাশ্মীর এবং অন্যপ্রান্তে লাদাখ। ১৭,০০০ ফুট উঁচু অত্যন্ত দুর্গম আকসাই চীন, অতি প্রাচীন এক বাণিজ্যপথ। সুদূর অতীতে কেবল গ্রীষ্মকালে কয়েক মাস এই পথে তিব্বত থেকে সিল্ক, জেড পাথর, শণ, নুন ও পশম নিয়ে সওদাগররা আসত ভারতে। এর পূর্ব সীমানায় আছে তিব্বত ও ভারতের অরুণাচল প্রদেশ, আগে যাকে বলা হত নেফা। এই এলাকার সীমান্তরেখা কোথায়, কোন এলাকায় কার কতটুকু সার্বভৌম ক্ষমতা, তা নিশ্চিতভাবে নির্ধারিত হয়নি। বিগত দিনে চীনের আধা-সামন্ততান্ত্রিক ও আধা-ঔপনিবেশিক শাসকদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ, পশ্চিম দিকে আকসাই চীন ও তিব্বত ভূখণ্ডের যতটা সম্ভব দখল করেছিল। এই এলাকায় প্রকৃত সীমানা কখনই নির্ধারিত হয়নি, তাই এই অঞ্চলকে নিয়ে বিরোধ থেকে গিয়েছে। ১৯৬২ সালে যুদ্ধ বেধেছিল, এই আকসাই চীন ও অরুণাচল প্রদেশের ওপর কার সার্বভৌমত্ব, তা নিয়ে এবং ম্যাকমোহন লাইনের স্বীকৃতি নিয়ে। ভারতের দাবি হল, আকসাই চীন কাশ্মীরের অংশ, আর চীনের দাবি হল, এটা সিনকিয়াং প্রদেশের অংশ। নেফা ও অরুণাচল প্রদেশের একটা অংশকে চীন বলে দক্ষিণ তিব্বত। এই দাবি ও পাল্টা দাবি প্রসঙ্গে এই অঞ্চলের ইতিহাস একবার দেখে নেওয়া যাক।

### আকসাই চীন

উনিশ শতকে কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে সম্পূর্ণ পাথুরে ঊষর বরফাবৃত আকসাই চীন ছিল চীন সম্রাটের রাজত্বের প্রান্তবর্তী অঞ্চল। এই অঞ্চলের ওপর চীন সম্রাটের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ সুদৃঢ় ছিল না। আকসাই চীন নিয়ে ব্রিটিশ সরকার ও চীনের সম্রাটের মধ্যে আলোচনার নিষ্পত্তিও হয়নি। ১৮৬৫ সালে ব্রিটিশ জরিপ আধিকারিক ডব্লু এইচ জনসন মাপজোক করে কাশ্মীরের রাজার সঙ্গে বোঝাপড়া করে জনসন লাইন চিহ্নিত করেন ও আকসাই চীনকে কাশ্মীরের অংশ হিসাবে দেখান। চীন এই বোঝাপড়া খারিজ করে এবং কোনরকম নিষ্পত্তি না করেই প্রাচীন সিনকিয়াং-লাদাখ বাণিজ্যপথ বরাবর কারাকোরাম গিরিপথ ধরে সীমানা চিহ্নিত করে দেয়। পরবর্তীকালে ব্রিটিশ শাসকরা এ নিয়ে আর তেমন নাড়াচাড়া করেনি এবং আকসাই চীনকে চীন প্রশাসনের হাতেই ছেড়ে দেয়। তাদের পরিষ্কার উদ্দেশ্য ছিল, রুশ সম্রাটের সম্ভাব্য আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আকসাই চীনকে বাধার প্রাচীর (বাফার) হিসাবে কাজে লাগানো। তখনকার সীমান্তরেখার নাম ছিল, ম্যাকার্টিনি-ম্যাকডোনাল্ড লাইন। ব্রিটিশ প্রশাসকরা আকসাই চীনকে ভারতের অংশ ও চীন সম্রাট চীনের অংশ হিসাবে দাবি করে আসছিল। বিংশ শতকের গোড়ায় রুশবিপ্লবের পর রাশিয়ার দিক থেকে আক্রমণের আশঙ্কা কমায় আকসাই চীন নিয়ে ইংরেজদের মাথাব্যথা আরও কমে যায় এবং এই অঞ্চলের সীমান্ত অনির্দিষ্ট ও অরক্ষিত থাকে। চীন-ভারত সম্পর্ক সংক্রান্ত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ

ছয়ের পাতায় দেখুন

# ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গে

পাঁচের পাতার পর

বিশ্লেষক নেভিল ম্যাক্সওয়েল বলেছেন, ব্রিটিশরা তাদের প্রয়োজনের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই অঞ্চলে নানা সময়ে ১১ টি সীমান্তরেখা নির্দিষ্ট করেছিল। ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার সময়ে জনসন লাইনকেই ব্রিটিশ শক্তি ভারতের পশ্চিম সীমানা হিসাবে মেনে নেয়। স্বাধীন ভারতের শাসকেরাও এর অন্যথা করেননি। ১৯৫৪ সালের ১ জুলাই ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুও এই কথাই বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, জনসন লাইন অনুসারে, আকসাই চীন শত শত বছর ধরে ভারতের লাদাখ অঞ্চলের অংশ, কাজেই এ নিয়ে আলোচনার কোনও অবকাশ নেই। কিন্তু রাজনৈতিক বিশ্লেষক জর্জ এন প্যাটারসনের মতে নিজ দাবির পক্ষে ভারত যে সব প্রমাণ দাখিল করেছে, সেগুলি খুব জোরালো নয় এবং সেগুলি যেসব সূত্র থেকে নেওয়া, সেগুলির বিশ্বাসযোগ্যতাও সন্দেহাতীত নয়।

১৯৪৯ সালে চীন বিপ্লবের পরে গণপ্রজাতন্ত্রী চীন আকসাই চীনকে চীনের অংশ হিসাবে দাবি করে। ১৯৫০-এর দশকে চীন আকসাই চীনের মধ্য দিয়ে রাস্তা তৈরি করে সিনকিয়াং ও তিব্বতকে সড়কপথে যুক্ত করে। চীনের দিক থেকে আকসাই চীনে যাওয়া সহজ হয়ে যায়,কিন্তু ভারতের দিক থেকে কারাকোরাম পর্বতমালা পার হয়ে আকসাই চীনের পথ দুর্গম থেকে যায়। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত চীনের তৈরি এই নতুন রাস্তা সম্পর্কে ভারত জানতই না। পরবর্তীকালে চীনের প্রকাশিত মানচিত্র দেখে ভারতের শাসকরা এই রাস্তার কথা জানতে পারে। তারপর থেকেই ভারতের শাসকরা আকসাই চীনের ওপর ভারতের দাবি জানাতে থাকে ও বিতর্কিত এলাকায় সেনাচৌকি তৈরি করে এবং সশস্ত্র টহলদারী চালু করে যাকে চীন অনুপ্রবেশ বলে প্রতিবাদ করে। এ নিয়ে কিছু ছোটখাট সংঘর্ষের পর উভয়পক্ষই স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে ও গোলাগুলি না চালাতে অঙ্গীকার করে।

**ম্যাকমোহন লাইন**

ব্রিটিশদের পরদেশে অনুপ্রবেশকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ-ভারত, চীন ও তিব্বতের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। বিরোধ মীমাংসা করে সম্প্রীতি ফেরাবার ঘোষিত লক্ষ্যে চীন, তিব্বত ও ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিদের নিয়ে ১৯১৩ সালে সিমলায় ব্রিটিশ সরকার এক ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকে। তৎকালীন ব্রিটিশ বিদেশ সচিব হেনরি ম্যাকমোহন সীমান্তরেখা নির্ধারণের একটি প্রস্তাব আনেন ও চীন সরকারকে এড়িয়ে কেবল তিব্বতের সঙ্গে আলোচনা করেন ও তাঁর প্রস্তাবিত 'বিজ্ঞানসম্মতভাবে' অঙ্কিত সীমান্তরেখা সম্পর্কে তিব্বতী প্রতিনিধিদের সম্মতি আদায় করেন। 'বর্মার পশ্চিমপ্রান্ত থেকে ভূটান পর্যন্ত টানা' এই লাইনের কোনও ম্যাপ চীনা প্রতিনিধিদের দেখানো হয়নি। কিন্তু ম্যাকমোহন চালাকি করে তাঁকে দিয়ে একটা অন্য ম্যাপে সই করিয়ে নেয়। অনেক ছোট স্কেলে আঁকা সেই ম্যাপে মূলত দেখানো হয়েছিল প্রস্তাবিত তিব্বতের বিভাজন। তিব্বতকে বহির্তিব্বত ও অন্তর্তিব্বত, এই দুই প্রস্তাবিত ভাগে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে অঙ্কিত এই ম্যাপে চাতুর্যের সাথে ম্যাকমোহন লাইনটি ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছিল (সূত্র ঃ নেভিল ম্যাক্সওয়েল, ইন্ডিয়াজ চায়না ওয়ার)। এইভাবে ব্রিটিশ প্রশাসকরা ধূর্তামি করে তিব্বতের প্রতিনিধিদের স্বাক্ষর আদায় করে ও তাদের এর সঙ্গে জড়িয়ে দেয়। আবার চালাকি করে পেশ করা ম্যাপে চীনের প্রতিনিধিদের দিয়ে সই করিয়ে নেয়। তিব্বত সরকার তিব্বতী প্রতিনিধির এই সম্মতিকে খারিজ করে। চীন সরকারও বলে, ব্রিটিশ ও তিব্বতী প্রতিনিধির সমঝোতা বেআইনি ও তা তারা মানবে না। চীন সরকার পরবর্তীকালে, প্রস্তাবিত অন্তর্তিব্বত ও বহির্তিব্বত বিভাজনরেখায় আপত্তি জানায় এবং তাকে সরকারি অনুমোদন দেয়নি। ম্যাকমোহন নিজেও খেদের সঙ্গে স্বীকার করেছেন, ১৯১৩ সালের সিমলা কনফারেন্সে ''ত্রিপাক্ষিক চুক্তিতে চীন সরকারের আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি না পেয়েই আমাকে ভারত ছেড়ে যেতে হচ্ছে, এটা খুবই দুঃখের কথা। সিমলা সম্মেলনের কয়েক মাসের মধ্যে চীন ম্যাকমোহন লাইন ছাড়িয়ে আরও দক্ষিণে (মানে ভারতের দিকে) সীমান্তরেখা টানে। ম্যাকমোহন লাইনে বাণিজ্যকেন্দ্র তাওয়াং-কে ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভুক্ত করায় তিব্বত আপত্তি করে। এছাড়া ম্যাকমোহন লাইনের আর কোনও অংশের বিরুদ্ধতা তিব্বত করেনি। ম্যাকমোহনের এই কাপুরুষোচিত ধূর্তামির সাহায্যে ব্রিটিশ ৬০,০০০ বর্গমাইল ভূমি দখল করে, যা এতদিন বৃহত্তর তিব্বতের অংশ হিসাবে চীন তার নিজস্ব এলাকা বলে মনে করত এবং চীন ও ব্রিটিশের সরকার স্বীকৃত ম্যাপেও যা চীনের অংশ বলে দেখানো হতো। পরবর্তীকালে বহু বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু ম্যাকমোহন লাইন, এভাবেই টানা হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই প্রতারণা ধরা পড়ে গেলে ব্রিটিশ শক্তি এ নিয়ে আর উচ্চবাচ্য করেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত তিব্বতী প্রশাসকেরাই পূর্ণ কর্তৃত্ব নিয়ে তাওয়াং শাসন করেছে। ১৯৩০ এর আগে পাহাড়ের নিচ দিয়ে চীনের সীমান্তরেখার পালটা সীমান্তরেখা হিসাবে ম্যাকমোহন লাইনকে দেখান হতো। ১৯৩০ দশকের শেষ দিক থেকে ব্রিটিশরা এই এলাকার ম্যাপে ম্যাকমোহন লাইনকেই স্বীকৃত সরকারি সীমান্তরেখা হিসাবে দেখাতে শুরু করে। নতুন ম্যাপে ম্যাকমোহন লাইনকেই সুনির্দিষ্ট ও চূড়ান্ত আন্তর্জাতিক সীমানা হিসাবে দেখানো হয়। পশ্চিমদিকে আকসাই চীনের ক্ষেত্রেও, সদ্যস্বাধীন পুঁজিবাদী ভারতের পুঁজিবাদী শাসকেরা ঔপনিবেশিক আমলের জের হিসাবে পাওয়া সীমান্ত বিতর্কের সুচিন্তিত বিবেচনা করা ও মীমাংসা করার বাধ্যবাধকতা অনুভব করেনি। বরং ভূটান এলাকায় বিতর্কিত ম্যাকমোহন লাইনকেই তারা উত্তর সীমান্ত বলে গ্রহণ করে। পরবর্তীকালেও সর্বদা ভারত এই লাইনকেই স্বীকৃত সীমানা বলে তুলে ধরেছে। পরবর্তীকালে ভারত সরকার বলে, হিমালয় পর্বতের উচ্চতম শৈলশিরা ধরে এই ম্যাকমোহন লাইন টানা হয়েছে, ম্যাপে যার নিচের অংশ, অর্থাৎ হিমালয়ের দক্ষিণাংশ পরম্পরাগতভাবে ভারতের অংশ বলে স্বীকৃত। অন্যদিকে চীন সরকারের দাবি হল, বিতর্কিত এলাকা প্রাচীনকাল থেকেই ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে তিব্বতের অংশ।

**স্বাধীনতা উত্তরকালে সংকট আরও বাড়ে**

আমরা আগেই বলেছি, সদ্যস্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওয়াহরলাল নেহেরু বলেন, চীন সহ অন্যান্য প্রতিবেশী দেশগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও ভ্রাতৃপ্রতিম সম্পর্ক রাখতে ভারত আগ্রহী। কিন্তু ঘটনা যেভাবে গড়ায়, তাতে এই আগ্রহের যাথার্থ সম্পর্কেই প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করে। মৈত্রীর আহ্বান জানানোর সাথে সাথে এক নিঃশ্বাসেই বলা হয়, — বিতর্কিত সীমান্তরেখা ম্যাকমোহন লাইন নিয়ে কোনও আলোচনা হতে পারে না। ঠিক ব্রিটিশদের মতোই ভারত সরকার সীমান্তে অগ্রগামী সামরিক টহলদারি শুরু করে এবং বিতর্কিত এলাকার অনেক ভেতরে, পশ্চিম ও পূর্ব খণ্ডে জম্মু-কাশ্মীর থেকে নেফা পর্যন্ত সামরিক চৌকি তৈরি করে।

বাস্তবে, সীমান্ত নিয়ে বিতর্কের মীমাংসার বদলে বিরোধের পাহাড় জমতে থাকে। বিরোধ ক্রমশ তিক্ত থেকে তিক্ততর হয়ে, গোলাগুলি বিনিময়, খণ্ডযুদ্ধ থেকে শেষে ১৯৬২-র সীমান্তযুদ্ধে দাঁড়ায়। এশিয়ার বৃহৎ এই দুই দেশের মধ্যে অবাঞ্ছিত ঘটনাস্রোত আন্তর্জাতিক রূপ নেয়। যুদ্ধবাজ সাম্রাজ্যবাদ, বিশেষত মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ও সিআইএ নাক গলাবার সুযোগের সন্ধান করতে থাকে। দুই দেশের মধ্যে একটি সমাজতান্ত্রিক দেশ হওয়ায় তাদের নাক গলানোর আগ্রহ ছিল খুবই বেশি। আবার বিরোধ এমন দু'টি দেশের মধ্যে, যে দেশ দু'টি সদ্যস্বাধীন আফ্রো-এশীয় দেশগুলির অগ্রগতির অনুকূলে শান্তির শক্তি হিসাবে প্রধান ভূমিকা নিতে পারে। তাই, বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় শান্তিকামী মানুষও এই বিরোধে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তাই এই বিরোধের কারণ নিয়ে গভীর ও ব্যাপক চর্চা চলে, গবেষণা হয়, এবং কোন পক্ষ ঠিক, কোন পক্ষ বেঠিক সে সম্পর্কে বহু নতুন নতুন তথ্য বেরিয়ে আসে। এতদিন অজানা বহু তথ্য ও ঘটনা, যার সঠিক মূল্যায়ন হয়নি, তা গ্রন্থাকারে এমন সুসজ্জিতভাবে উপস্থাপিত হয়, যা এই বিরোধের যুক্তিসম্মত সমাধানের ভিত্তি হতে পারে। এগুলির সত্যতা চালেঞ্জ করাও কঠিন, এ ধরনের উদ্‌ঘাটিত কিছু তথ্য ও ঘটনা ভারতের দাবির অসংগতির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। উল্লেখযোগ্য এইসব গ্রন্থের মধ্যে আছে স্টিভেন হফম্যান রচিত, ইন্ডিয়া অ্যান্ড চায়না ক্রাইসিস (ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া প্রেস ১৯৯০); জন, ডব্লু গ্রোভারের নিবন্ধ চায়নাজ ডিসিশন ফর ওয়ার উইথ ইন্ডিয়া ১৯৬২; অস্ট্রেলিয়ান সাংবাদিক ও ইতিহাসবিদ নেভিল ম্যাক্সওয়েলের ইন্ডিয়াজ চায়না ওয়ার; বিখ্যাত দার্শনিক ও শান্তিযোদ্ধা বার্ট্রান্ড রাসেলের আনআর্মড ভিকট্রি। এসব গ্রন্থে উত্থাপিত প্রসঙ্গ গুলিকে ভারত সরকার খোলা মনে নেয়নি, বা উপযুক্ত গুরুত্ব দেয়নি। বরং এ ধরনের কিছু বই ভারতে ঢোকা ভারত সরকার বন্ধ করে। কিন্তু এইসব বইয়ের অনেকগুলিই ঐতিহাসিকভাবে মূল্যবান।

হফম্যান দেখিয়েছেন, জওয়াহরলাল নেহেরু, বলা ভালো 'ভারতের শাসকরা' নিজেদের দাবিতে অনড়। সকল আলোচনা, ঘোষণা ও বোঝাপড়ায় এসে তাঁরা একই কথা বারবার বলে যাচ্ছেন। বলছেন, 'ম্যাকমোহন লাইন নিয়ে কোনও আলোচনা হবে না', ওই লাইন 'অপরিবর্তনীয়'; পরম্পরাগতভাবে এই লাইন দীর্ঘদিন চলে আসছে। ভৌগোলিকভাবে এবং স্বাভাবিক স্বীকৃত সীমানা হিসাবে চিরদিনের জন্য মান্যতা পেয়েছে। ১৯৫০ সালের ২০ নভেম্বর নেহরু ভারতীয় সংসদে বলেন, উত্তর-পূর্বে ম্যাকমোহন লাইনই ভারত ও তিব্বতের সীমানা।'' নেহরু একথাও মেনে নিতে বাধ্য হন, অনেকটা দক্ষিণে বিকল্প একটা সীমান্তরেখাও ''দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে ম্যাপে দেখানো হয়েছে।'' তারপরই তিনি বলেন, ''(চীনের) ম্যাপে যাই থাক না থাক, ম্যাকমোহন লাইনই সীমান্তরেখা।'' ''আমরা কাউকে তা অতিক্রম করতে দেব না।'' (সূত্র ঃ ইন্ডিয়াজ চায়না ওয়ার, নেভিল ম্যাক্সওয়েল)।

বাস্তবেও ভারতের পরম্পরাগত অধিকারের দাবি অকাট্য বলে দাঁড় করানো হয়। ১৯৫৮-র ফেব্রুয়ারিতে এক দল ভারতীয় কর্মকর্তা ও শক্তিশালী আধা-সামরিক বাহিনী তাওয়াং-এ তিব্বতী মঠ দখল করে মঠের পরিচালকদের বের করে দেয়। এই ঘটনার আগেই চীনের গণমুক্তি ফৌজের সাহায্যে তিব্বতের জনগণ প্রতিক্রিয়াশীল বিদ্রোহী লামাতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়েছে এবং তিব্বত গণপ্রজাতন্ত্রী চীনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। এই অবস্থায় ভারতের কার্যকলাপ স্থিতাবস্থায় আঘাত হানে। কিন্তু নবগঠিত চীন সরকার কোনও প্রত্যাঘাত করেনি। এর কিছুদিন পরে ১৯৫৫ সালে বান্দুং শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। আমরা আগেই বলেছি, বান্দুং সম্মেলনে সীমান্তবিরোধ মীমাংসার জন্য চীন কিছু সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দেয়। প্রতিবেশী বর্মার সঙ্গে চীনের আচরণ থেকে বোঝা যায়, তাদের প্রস্তাব ছিল আন্তরিক। এই সময়ে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এই বিতর্ক নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে কিছু চিঠি লেখেন। চিঠির সুর ছিল অন্তরঙ্গ ও আন্তরিক। ১৯৫৮-র ডিসেম্বরে নেহরুকে লেখা এক পত্রে চৌ এন-লাই লেখেন, ''আকসাই চীন বরাবরই চীনের অন্তর্ভুক্ত ছিল'' এবং বরাবরই চীনা রক্ষীবাহিনী এখানে টহলদারী চালায়। সাথে সাথে তিনি বলেন, তিব্বত এলাকায় চীনের ওপর আগ্রাসন চালানোর পলিসি থেকে তৈরি হয়েছে ম্যাকমোহন লাইন, তাই তা বে-আইনি। কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের স্বার্থে চীন এ নিয়ে আলোচনায় প্রস্তুত। চৌ এন-লাই ও নেহরু, উভয়েই এই অঞ্চলে স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে একমত হন। অচিরেই প্রমাণ হয়, এই ঐকমত্য কত ঠুনকো। আগেই বলা হয়েছে, আলোচনার ক্ষেত্রে, ম্যাকমোহন লাইন আলোচ্য হতে পারে না, এই পূর্বশর্তে ভারত অনড় ছিল।

ইতিমধ্যে ১৯৫৯ সালের ২৫ আগস্ট, ম্যাকমোহন লাইনের উত্তর-পূর্ব দিকে লংজু-তে দু'দেশের টহলদার বাহিনীর মধ্যে গোলাগুলি চলে। দু'পক্ষই একে অপরকে প্রথম গুলি চালানোর অপরাধে অভিযুক্ত করে। এই অবস্থায়, পরিস্থিতি যাতে আরও ঘোরালো হয়ে না ওঠে, সেজন্য কেবল দু'দেশের সরকার নয়, দু'দেশের জনগণেরও পক্ষপাতহীনভাবে যুক্তির ভিত্তিতে বিচার করে দেখা

আটের পাতায় দেখুন

> চীন ও ভারত দু'দেশের জনগণকেই, নিজ নিজ প্রয়োজন থেকেই সীমান্ত বিরোধের মীমাংসা ত্বরান্বিত করার জন্য অগ্রণী হতে হবে। এই সমস্যার সমাধান যেহেতু একমাত্র আন্তর্জাতিকতাবাদের আদর্শের ভিত্তিতেই হতে পারে, তাই ভারতের জনগণকে যেমন পুঁজিবাদ উচ্ছেদ করে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে, চীনের জনগণকেও তাঁদের দেশের পুঁজিবাদকে খতম করে পুনরায় সমাজতন্ত্র ফিরিয়ে আনার সংগ্রাম নতুন করে গড়ে তুলতে হবে। এই প্রয়োজন থেকে সর্বাগ্রে পুঁজিবাদবিরোধী বিপ্লবী আদর্শের ভিত্তিতে উভয় দেশের জনগণের মধ্যে সম্প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। সাথে সাথে ভারতের জনগণকে বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে সীমান্তবিরোধকে কাজে লাগিয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের তৈরি ফাঁদে ভারত সরকার না পা দেয়।

## দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

# বার্লিন বিজয়ের নেপথ্যে

(১৯৪৫ সালের ৮মে জার্মানির রাজধানী বার্লিনে সোভিয়েট লালফৌজের কাছে জার্মান সেনা আত্মসমর্পণ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভয়াবহ ধ্বংসকাণ্ড, কোটি কোটি মানুষের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সোভিয়েট লালফৌজ মানবজাতিকে রক্ষা করে। ৮মে বিজয়দিবস হিসাবে পালিত হয়।

সাধারণ ভাবে সকলেই জানেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন, আমেরিকা ও ব্রিটেন ঐক্যবদ্ধ হয়ে জার্মানি, ইটালি, জাপান সামরিক চক্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিল এবং সম্মিলিত যুদ্ধে ফ্যাসিস্ট শক্তিকে পরাস্ত করেছিল। কিন্তু যেটা অনেকেই হয়তো জানেন না এবং পশ্চিমী দুনিয়া থেকে প্রকাশিত বইয়ে যে তথ্য পাওয়াও যায় না, তা হচ্ছে, পশ্চিমের ওই তথাকথিত গণতন্ত্রীরা কীভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েট ইউনিয়নকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্র করেছিল। গণতন্ত্রের ভেক ধরা এই সাম্রাজ্যবাদীরা তাই স্বভাবতই সোভিয়েট সমাজতন্ত্রের পতনে উল্লসিত। কিন্তু যতই তারা উল্লাস করুক, সামাজিক নিয়মেই সমাজতন্ত্রের জন্য মানুষ আবার লড়াই করবে। এই লড়াইয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ইতিহাস জানা প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যেই কানাডা থেকে প্রকাশিত 'নর্থস্টার কম্পাস' পত্রিকার মে '০৯ সংখ্যায় প্রকাশিত রাশিয়ার পাভেল ক্রাসনভ-এর একটি নিবন্ধ, ৮ মে দিনটিকে স্মরণ করে এখানে প্রকাশ করা হল।)

১৯৪৫ সালের ৮মে জার্মানি আত্মসমর্পণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। এর বহুদিন আগেই সোভিয়েট সেনারা বার্লিন দখল করে নিয়েছিল এবং হাঙ্গেরি ও চেকোস্লোভাকিয়ায় বড় বড় জার্মান সেনাদলকে ধ্বংস করেছিল। এই কাহিনী সকলেই জানেন এবং 'ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদকে মিত্রশক্তি পরাস্ত করে মানবজাতিকে রক্ষা করেছিল' এই কথাগুলো এমনভাবে বলা হয়, যেন সমস্ত বিষয়টাই অত্যন্ত সহজ সরল ছিল।

কিন্তু এ কথাগুলো হচ্ছে যুদ্ধজয়ের ইতিহাসের নামে বানানো গল্প, যার সাথে বাস্তব ঘটনাবলীর কোনও মিল নেই বললেই চলে। পশ্চিমী যে বুর্জোয়া শক্তিগুলিকে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে টেনে এনেছিল সোভিয়েট রাশিয়া, তারা বাস্তবে ছিল দস্যু দল। এরা সোভিয়েট ইউনিয়নকে ধ্বংস করার জন্য শুধু হিটলারকেই সৃষ্টি করেনি, যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই সোভিয়েটকে পিছন থেকে ছুরি মারার পরিকল্পনাও করছিল। উপরন্তু জার্মান সেনাবাহিনীর যে অংশটা তখনও অক্ষত ছিল, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে আক্রমণে তাদের সাহায্য নেওয়ার ছক কষছিল।

বিজয়ের পর বিস্ময়করভাবে যৌথ বিজয় কুচকাওয়াজ হয়নি, যেটা মিত্রশক্তিগুলোর মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলে অবশ্যই হওয়ার কথা। বার্লিনে ঐক্যবদ্ধ 'ভিকট্রি প্যারেডে' আমেরিকার সেনাপ্রধান আইজেনহাওয়ার ও ব্রিটেনের সেনাপ্রধান মন্টোগোমারি অংশ নিতে অস্বীকার করেন। এ সত্ত্বেও ১৯৪৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর বার্লিনে বিজয় প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কিন্তু অভিনন্দন জানাবার জন্য উপস্থিত ছিলেন শুধু মার্শাল জুকভ। মিত্রপক্ষের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতারা ঐ প্যারেডে আসেননি। মিত্রপক্ষের তরফ থেকে কেবলমাত্র পশ্চিম বার্লিনের গ্যারিসন ইউনিটের সেনারা উপস্থিত ছিল।

এর কারণ হচ্ছে, ইতিপূর্বেই ৬-৭ মে-র রাত্রে জার্মানরা যে আত্মসমর্পণ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল, সেই অনুষ্ঠানটা হয়েছিল রাইমে-তে, মিত্রপক্ষের একটি সামরিক দপ্তরে। সেখানো যাওয়ার সময়ও সোভিয়েট নেতারা পাননি। 'মিত্রশক্তি'রা সোভিয়েটকে প্রতারণা করারই চেষ্টা চালিয়েছিল।

আরও ঘটনা হল, ইয়ালটা সম্মেলনে রুজভেল্ট, চার্চিল ও স্ট্যালিনের স্বাক্ষরিত যে চুক্তি হয়েছিল, 'মিত্রশক্তিরা' সেই চুক্তিকে সরিয়ে রেখে একটা নতুন দলিল তৈরি করে। ইয়ালটা চুক্তিতে যে সব বিষয় তাদের অপছন্দ ছিল, নতুন দলিলে সেগুলো বাদ দেওয়া হয়। এমনকী সোভিয়েটের নামোল্লেখ পর্যন্ত এই দলিলে করা হয় না, যাতে মনে হয় যেন যুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়ন অংশই নেয়নি। এই নতুন দলিলের কপিও সোভিয়েট ইউনিয়নকে পাঠাবার আগেই জার্মানদের দিয়ে দেওয়া হয়। ৭ মে চার্চিল ও ট্রুম্যান ঘোষণা করেন যে, জার্মানবাহিনী আত্মসমর্পণ করবে মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনার কাছে। এই অবস্থায় শেষ পর্যন্ত একটা চূড়ান্ত চুক্তিতে ঐক্যবদ্ধভাবে সকলকে দিয়ে স্বাক্ষর করাবার জন্য সোভিয়েট ইউনিয়নকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। রাইমে-তে যে চুক্তি হয়েছিল, তাকে এরপর কূটনৈতিক ভাষায় 'প্রারম্ভিক চুক্তি' আখ্যা দেওয়া হয়।

এর আগেও মিত্রপক্ষের দেশগুলি খুব লজ্জাজনক ভূমিকা নিয়েছিল। যেমন এ কথা প্রায় সর্বজনবিদিত যে, অ্যালেন ডালেস মিত্রপক্ষের বুর্জোয়াদের তরফে নাৎসিদের সাথে আলোচনা চালাচ্ছিলেন। উভয়পক্ষের মধ্যে একটা সমঝোতাও হতে যাচ্ছিল, যেটা শেষপর্যন্ত স্ট্যালিনের হস্তক্ষেপে বন্ধ হয়। এ সত্ত্বেও কোনও সন্দেহ নেই যে, মিত্রপক্ষের পশ্চিমী দেশগুলোর সঙ্গে জার্মানদের কিছু গোপন চুক্তি হয়েছিল। এর ফলেই ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ দিক থেকে পশ্চিম ফ্রন্টের কার্যত কোনও অস্তিত্বই ছিল না, পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্মানবাহিনী বিপুল পরিমাণ ভূখণ্ড ছেড়ে দিয়ে কোনও যুদ্ধ ছাড়াই পিছিয়ে এসেছিল। অথচ পূর্ব রণাঙ্গনে প্রতি মিটার জমির জন্য তারা তখন তীব্র যুদ্ধ করছিল। নাৎসিদের ও 'মিত্র' দেশগুলির একটাই লক্ষ্য ছিল — রুশবাহিনীকে মধ্য ইউরোপে ঢুকতে না দেওয়া। এ কথা চার্চিল প্রকাশ্যে বলেও ছিলেন। নাৎসিদের সঙ্গে প্রকাশ্য চুক্তিতে যাওয়া যেহেতু ওদের পক্ষে অসুবিধার ছিল, সেজন্যই ওরা এই কৌশল নেয়।

এই কৌশল অনুযায়ী পরিকল্পনা করা হয় যে, বার্লিন কার্যত বিনা যুদ্ধে আত্মসমর্পণ করবে এবং তার দ্বারা এই সত্যটা চাপা দেওয়া হবে যে, যুদ্ধ জয়ের মূল কারিগর সোভিয়েট ইউনিয়ন। শুধু তাই নয়, আরও পরিকল্পনা ছিল যে, জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধশেষে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে আক্রমণ হানার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের গোড়ায় চার্চিল ব্রিটিশ সামরিক কর্তাদের নির্দেশ দেন, সোভিয়েটের উপর আচমকা আক্রমণ হানার পরিকল্পনা তৈরির জন্য। যার নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন আনথিংকেব্‌ল'। এই দলিলটি এখন আর 'গোপন নথি' নয়। রাশিয়ার মহাফেজখানায় বর্তমানে এই দলিলটি সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

পরিকল্পনা ছিল, ১৯৪৫ সালের ১ জুলাই ব্রিটেন ও আমেরিকার ৪৭ ডিভিশন সেনা যুদ্ধ ঘোষণা না করেই রুশবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালাবে। তাদের সাহায্য করবে ১২ ডিভিশন জার্মান সেনা, যাদের তখনও ইচ্ছাকৃতভাবে অস্ত্রসজ্জিত রাখা হয়েছিল। মিত্রপক্ষীয় সেনাদের সাথে যাতে জার্মান সেনারা একযোগে আক্রমণ চালাতে পারে সেজন্য তাদের ব্রিটিশ প্রশিক্ষক দিয়ে ট্রেনিং দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চার্চিলের নির্দেশে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র হাতের কাছে মজুত রাখা হয়েছিল।

পশ্চিমী দেশগুলির দ্বারা সম্মিলিত আক্রমণ চালাবার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই যুদ্ধে পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রোমানিয়া, ফিনল্যান্ড ও অন্যান্য কিছু দেশকেও যুক্ত করে নেওয়ার কথা ছিল। লক্ষ্য ছিল সোভিয়েট ইউনিয়নকে সম্পূর্ণ ভাবে ধ্বংস করা এবং সোভিয়েট রাষ্ট্রকে খণ্ড খণ্ড উপনিবেশে ভাগ করে দেওয়া। প্রবল সন্ত্রাস সৃষ্টি করে রুশ জনগণের মনোবল ভেঙে দিতে ওরা পরিকল্পনা করেছিল, মস্কো, লেনিনগ্রাদ, ভ্লাদিভস্তক, মুরমান্স্ক ইত্যাদি শহরকে গুঁড়িয়ে দেওয়ার। আগুনের ঝড় তুলে লক্ষ লক্ষ রুশ জনগণকে হত্যা করার। এভাবেই হামবুর্গ, ড্রেসডেন, টোকিয়ো প্রভৃতি শহরকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল।

যাই হোক, পরিকল্পিত যুদ্ধ শুরু করার দু'দিন আগে ২৯ জুন লালফৌজ অপ্রত্যাশিত ভাবে নিজেদের বিচ্ছিন্নতা কাটিয়ে আবার সংঘবদ্ধ হয়ে যায় এবং আক্রমণ প্রতিহত করার প্রস্তুতি নিয়ে নেয়। মিত্রদেশগুলির চক্রান্তের খবর স্ট্যালিন পেয়ে যান, সামরিক কর্তাদের প্রয়োজনীয় নির্দেশও দিয়ে দেন। সৌভাগ্যক্রমে স্ট্যালিন তখনও সোভিয়েটের কর্ণধার ছিলেন বলেই সম্ভাব্য যুদ্ধকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে মিত্রশক্তিরা ভেবেছিল, দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর লালফৌজ যথেষ্ট ক্লান্ত, তাদের যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম ও অস্ত্রের ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষিত, সরবরাহও বন্ধ হওয়ার মুখে। পশ্চিমী এই ষড়যন্ত্রে বার্লিনের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নাৎসিদের লক্ষ্য ছিল, সোভিয়েট সেনাদের সামনে বার্লিনকে স্ট্যালিনগ্রাদের মতো খাড়া করা। ভেবে নেওয়া হয়েছিল যে, বার্লিনের রাস্তায় রাস্তায় লড়তে হলে সোভিয়েট সেনারা আরও দুর্বল হয়ে যাবে। তারপরই জার্মান সেনাদের সরিয়ে এগিয়ে আসবে মিত্রপক্ষের সেনারা। তারা তখন সোভিয়েট লালফৌজকে তাড়া করে ভলগা নদীর তীর পর্যন্ত ঠেলে দেবে। সে সময় মিত্রপক্ষের সেনারা বার্লিন থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে ছিল। জার্মান সেনাদের বলা হয়েছিল, যেকোনও মূল্যে সোভিয়েট সেনাদের আটকে দিতে হবে। বার্লিন যেন তারা কোনও ভাবেই দখল করতে না পারে। এ জন্য জার্মান সেনারা লড়াইও চালিয়েছিল সাহসের সঙ্গে।

একই কারণে বার্লিন দখল করা ছিল সোভিয়েটের কাছেও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। 'মিত্র' দেশগুলিকে দেখানোর দরকার ছিল যে, যুদ্ধের পরিণাম শেষপর্যন্ত নির্ধারিত হয় স্থলযুদ্ধে — আকাশ বা নৌ যুদ্ধে নয়।

বার্লিনকে পরিণত করা হয়েছিল সামরিক দিক থেকে দুর্ভেদ্য এক নগরদুর্গে। শহরের সমস্ত বড় বড় বাড়িগুলোতে সামরিক ঘাঁটি করা হয়েছিল, ভূগর্ভস্থ টানেলের সাহায্যে এদের মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তোলা হয়েছিল। ওন্ডার নদীর পর থেকেই বার্লিনকে ঘিরে বাঙ্কার ও অন্যান্য সামরিক সরঞ্জাম দিয়ে এক বিরাট প্রতিরক্ষা প্রাচীর গড়ে তোলা হয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত এসব দিয়ে বার্লিনকে রক্ষা করা যায়নি।

বার্লিন অভিযানে সোভিয়েট লালফৌজের প্রবল শক্তি দেখে মিত্রপক্ষের সেনাকর্তারা মুষড়ে পড়েন। বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহারে, শত্রুপক্ষের দেওয়াল ভেঙে ভিতরে গিয়ে আঘাত করতে পারার ক্ষমতায় লালফৌজ চমকপ্রদ পারদর্শিতা দেখায়। এই ঘটনায় পশ্চিমের সামরিক বিশেষজ্ঞদের মাথা ঘুরে যায়। নতুন ভাবে বিশ্লেষণ করতে বসে তাঁরা সিদ্ধান্তে আসেন যে, আকাশ ও সমুদ্র যুদ্ধে ইউরোপের সোভিয়েটবিরোধী জোটের যত বেশি প্রাধান্যই থাকুক না কেন, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে সরাসরি আঘাত হানলে, জোটের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। দুই থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে লালফৌজ তাদের তাড়িয়ে ইংলিশ চ্যানেলে নিয়ে ফেলবে। এমনকী আমেরিকা যদি পারমাণবিক বোমা নিয়েও আক্রমণ চালায়, তাতেও পরিস্থিতি পাল্টাবে না।

স্ট্যালিনের সিদ্ধান্তে লালফৌজের বার্লিন অভিযানই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ আটকে দিয়েছিল। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে রাশিয়ার মহাফেজখানায় সংরক্ষিত দলিলে। স্ট্যালিন যদি না থাকতেন, তাহলে বার্লিন কোনও যুদ্ধ ছাড়াই মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করত এবং সাথে সাথেই ইউরোপ ও আমেরিকার সামরিক শক্তি একজোট হয়ে সোভিয়েট ইউনিয়নের ওপর আক্রমণ চালাত।

**সোভিয়েট লালফৌজ ও**
**জে ভি স্ট্যালিন জিন্দাবাদ!**

R. No 5268 / 60
Postal Registration No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/2007-09
P. R.(Fgn) No. SSRM/KOL/RMS/WB/RNP - 138/FGN - 028/2007-09



# ভারত-চীন সীমান্ত বিরোধ প্রসঙ্গে

ছয়ের পাতার পর

দরকার ছিল, ঠিক কী ঘটেছে। বাস্তবে দেখা গেল, আচমকা ভারত সরকার 'চীনা আগ্রাসনে'র বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। পুরো কেন্দ্রীয় সংসদ, শাসক কংগ্রেস, এমনকী বিরোধীপক্ষ একই সুরে চিৎকার শুরু করে। প্রচারমাধ্যমগুলিও সোচ্চার হয়। ফলে উগ্র জাতীয়তাবাদের বন্যা যুক্তির মনোভাবকে ভাসিয়ে দেয়।

> বিশ্বের গণতন্ত্রপ্রিয় শান্তিকামী মানুষও এই বিরোধে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। তাই এই বিরোধের কারণ নিয়ে গভীর ও ব্যাপক চর্চা চলে, গবেষণা হয়, এবং কোন পক্ষ ঠিক, কোন পক্ষ বেঠিক সে সম্পর্কে বহু নতুন নতুন তথ্য বেরিয়ে আসে। এতদিন অজানা বহু তথ্য ও ঘটনা, যার সঠিক মূল্যায়ন হয়নি, তা গ্রন্থাকারে এমন সুসজ্জিতভাবে উপস্থাপিত হয়, যা এই বিরোধের যুক্তিসম্মত সমাধানের ভিত্তি হতে পারে। এগুলির সত্যতা চালেঞ্জ করাও কঠিন, এ ধরনের উদ্‌ঘাটিত কিছু তথ্য ও ঘটনা ভারতের দাবির অসংগতির দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। ... এসব গ্রন্থে উত্থাপিত প্রসঙ্গগুলিকে ভারত সরকার খোলা মনে নেয়নি, বা উপযুক্ত গুরুত্ব দেয়নি। বরং এ ধরনের কিছু বই ভারতে ঢোকা ভারত সরকার বন্ধ করে।

**এস ইউ সি আইয়ের বক্তব্য**

দুনিয়াজোড়া উন্মাদনা ও বিভ্রান্তির মধ্যে, প্রাপ্ত তথ্য ও রাজনৈতিক বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করে, ১৯৯৫ সালের ১৪ অক্টোবর এস ইউ সি আই কেন্দ্রীয় কমিটি একটি সুচিন্তিত বিবৃতি দেয়। সেই বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, ভারত-চীন সীমান্তরেখার বিতর্কিত ও সুচিন্তিত নয়, এমন অংশগুলিকে নিয়ে যেকোনও সময়ে তিক্ত বিরোধ দেখা দিতে পারে। আর তা যদি দেখা দেয়, তবে তা, দু'দেশের জনগণের ঐক্যের ওপর অশুভ ছায়া ফেলবে এবং উভয় দেশের বিপ্লবী সংগ্রামের অগ্রগতির পথকে বাধাগ্রস্ত করবে। বিবৃতিতে এও বলা হয়েছিল যে, এই বিরোধ যুদ্ধোন্মাদনাকে উস্কে তুলতে পারে ও দেশের বুকে ফ্যাসিবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য ভারতের শাসকরা তা কাজে লাগাতে পারে। অন্যদিকে এই বিরোধ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী শান্তি আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করবে, অধিকন্তু ভারতের মতো দেশকে সাম্রাজ্যবাদী শিবিরের দিকে ঠেলে দেবে এবং বিশ্বের এই অংশে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ষড়যন্ত্র কার্যকর করার পথকেই প্রশস্ত করবে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, '' বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে আমরা দু'টি সীমান্তরেখা দেখতে পাচ্ছি। একটি হল ম্যাকমোহন লাইন, আর দ্বিতীয় লাইনটি হল সেটাই, যেটা চীনের ম্যাপে দেখানো হয়েছে। এই দু'টি লাইনের মধ্যে রয়েছে ৯০,০০০ বর্গকিলোমিটার বিতর্কিত এলাকা। এই বিতর্কের মীমাংসার জন্য চীন সরকার প্রস্তাব দেয়, ইতিহাস,পরম্পরা, ও বিদ্যমান দু'টি সীমান্তরেখাকে বিচারের মধ্যে নিয়ে আলাপ-আলোচনা শুরু করা হোক। তারা এও বলে যে, যতদিন না বিরোধের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হচ্ছে, ততদিন দুপক্ষই স্থিতাবস্থা বজায় রাখবে।... ভারত সরকার... বলে ম্যাকমোহন লাইন ইতিমধ্যেই রয়েছে, কাজেই নতুন কোন সীমান্তরেখা নির্ধারণের প্রশ্নই ওঠে না। ... আজ পর্যন্ত, লংজুর ঘটনা ছাড়া, চীনের তরফে ম্যাকমোহন লাইন লঙ্ঘন করা হয়েছে, এমন একটি ঘটনার কথা ভারত সরকার বলতে পারেনি। অন্যদিকে ... ভারতীয় সেনা চীনের দেখানো সীমান্তরেখা লঙ্ঘন করা শুধু নয়, এমনকী খুব বেশিদূর না গেলেও, ম্যাকমোহন লাইনও অতিক্রম করেছে, ''... সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ''আপসে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সীমান্ত সমস্যার মীমাংসা করা দূরে থাক, ভারত সরকার ঐতিহাসিক পটভূমিটিকে পর্যন্ত বিবেচনায় নিতে চাইছিল না এবং চীন সরকার কর্তৃক ম্যাকমোহন লাইনের স্বীকৃতিকেই আলাপ-আলোচনা শুরু করার পূর্বশর্ত হিসাবে খাড়া করতে চাইছিল... কেন্দ্রীয় কমিটি মনে করে, ভারত সরকারের মনোভাব সীমান্তবিরোধের আপস মীমাংসা ও বান্দুং সম্মেলনে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের ভিত্তি হিসাবে গৃহীত পঞ্চশীল নীতির সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিহীন।

(ক্রমশ)

# ভারতেও মন্দার আঘাতে কাজ হারাচ্ছে মানুষ

নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং বলেছেন, নতুন সরকারের প্রথম কাজ হবে মন্দার আঘাত থেকে অর্থনীতিকে রক্ষা করা। প্রকাশিত তথ্যের ভিত্তিতে তাঁর মুখে কথাটা ভূতের মুখে রাম নামের মতো শোনাচ্ছে। কথাটা নতুন নয়, পঞ্চদশ লোকসভা নির্বাচনে যেসব কৃতিত্বের দাবি তিনি করেছিলেন, তার অন্যতম হল তিনি ও তাঁর দল কংগ্রেস নাকি দেশকে মন্দার আঘাত থেকে রক্ষা করেছেন। গণদাবী ১ - ৭ মে '০৯ সংখ্যায় এই মিথ্যা দাবির আসল চেহারা আমরা দেখিয়ে দিয়েছিলাম। পরিহাস এই যে, মনমোহন সিং যেদিন এই কথা বলেছেন সেদিনই সংবাদে প্রকাশ মন্দার চাপে এস ই জেড পর্যন্ত বিপন্ন। কংগ্রেস ও সি পি এম উভয়েই এস ই জেডগুলিকে শিল্পায়নের পরাকাষ্ঠা বলে চিহ্নিত করেছিল কিন্তু বাস্তবে এস ই জেড হল শ্রমিক শোষণের আধুনিকতম কানুনি ব্যবস্থা, যেখানে শ্রমিকদের মুখ বুজে মার খাওয়া ছাড়া কোনও উপায় নেই। তা সত্ত্বেও, সংবাদে প্রকাশ, ''মন্দার জেরে ওই সব প্রকল্প থেকে সরে আসতে চাইছে বিভিন্ন সংস্থা... পাঁচবছর আগে এস ই জেড আইন তৈরির আগে কেউ ভাবেনি, এই পরিস্থিতিতে পড়তে হবে।... পশ্চিমবঙ্গ, গুজরাত, হরিয়ানা ও ওড়িশায় তথ্যপ্রযুক্তির এস ই জেড গড়ার প্রস্তাব দিয়েছিল ডি এল এফ।... এখন সেই স্বীকৃতি বাতিল করতে চায় তারা।'' কিন্তু ইতিমধ্যেই প্রায় ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বিক্রয় করে ছাড় পেয়েছিল তারা, এখন সেই কর কী করে আদায় হবে তার কোনও ঠিক নেই। ভারত সরকার ৫৬৮ টি এস ই জেডের ঘোষণা করেছে ও ৩১৫ টির জন্য নোটিফিকেশন হয়ে গিয়েছে। এই অবস্থায় বজ্রপাত। বর্তমান আর্থিক বছরে (২০০৮-০৯) এস ই জেডগুলি থেকে রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১,২৫০০০ কোটি টাকা, বাস্তবে রপ্তানি হয়েছে মাত্র ৯০,৩৬৬ কোটি টাকার পণ্য। ওই দিনই সংবাদে প্রকাশ, হিরে শিল্পে মন্দার আঘাতে ভারতে দুই লক্ষ কর্মী কাজ হারিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে ওই দিনই দুটি চটকল বন্ধ হয়ে ১১ হাজার কর্মী বেকার হয়েছেন। পুঁজিবাদী মন্দার জোরালো আঘাত পড়েছে সফটওয়্যার রপ্তানির ক্ষেত্রে। ২০০৭-০৮ সালে সফটওয়্যার রপ্তানি থেকে আয় হয়েছিল, ১ কোটি ৪২ লক্ষ মার্কিন ডলার, ২০০৮-০৯ সালে সেটা কমে হয়েছে ১ কোটি ২৩ লক্ষ মার্কিন ডলার।

সংবাদে আরও প্রকাশ, মন্দার ধাক্কায় প্রত্যক্ষ কর বাবদ সরকারের আদায় লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ৮,০০০ কোটি টাকা কম হয়েছে। দায় এসে পড়বে বাজেটে। জনকল্যাণমূলক খাতগুলিতে আরও কমানো হবে সরকারি খরচ। এমনি করেই মন্দার বোঝা জনগণের ঘাড়ে চাপানো হবে আগামী দিনে যেমন হয়েছে আগে। আর ফাটা রেকর্ড বাজিয়ে সরকার বলবে, মন্দার আঘাত যত হতে পারত, তা হয়নি। কত যে হতে পারতো সেটাই কেউ জানে না।

# যুদ্ধকালীন তৎপরতা দাবি করলেন তরুণ মণ্ডল

একের পাতার পর

ডাঃ তরুণ মণ্ডল ২৫মে ক্যানিং এস ডি ও-র কাছে বাসন্তী, গোসাবা ও ক্যানিং-এর দুর্গত মানুষদের উদ্ধার ও ত্রাণে প্রশাসন কী ব্যবস্থা নিচ্ছে, তা জানতে চান এবং তাঁদের আরও তৎপর হওয়ার জন্য বলেন। ক্যানিং পূর্ব এবং পশ্চিম ক্যানিং-এ ঘূর্ণিঝড়ে অসংখ্য ঘর ভেঙেছে। বাসন্তী, গোসাবায় জলপ্লাবনে দলে দলে মানুষ ঘর ছেড়ে স্থানীয় স্কুলবাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। ক্যানিং এস ডি ও জানান যে, তাঁরাও সামরিক বাহিনীর সাহায্য চেয়েছেন।

ডাঃ তরুণ মণ্ডল ক্যানিং হাসপাতালে গিয়ে চিকিৎসাধীন আক্রান্তদের সাথে দেখা করেন। বি এম ও এইচ শ্রীমতী আত্রেয়ী চক্রবর্তীর সাথেও তাঁর কথা হয়। তিনি জানান, আক্রান্তের সংখ্যা ৩০০ জনের মতো এবং বিশেষ বিশেষ এলাকায় তাঁরা মেডিক্যাল টিম ও ওষুধ পাঠাচ্ছেন, বিশেষ করে গোপালপুর অঞ্চলে তা পাঠানো হয়েছে। ডাঃ তরুণ মণ্ডল বলেন, রোগ যেভাবে ছড়াচ্ছে, তাতে চিকিৎসার জন্য আরও ডাক্তার প্রয়োজন। সরকারের কাছে প্রয়োজনীয় ডাক্তার চাইবার জন্য তিনি বি এম ও এইচ-কে বলেন।

# বিপর্যয়ে মানুষকে বাঁচাতে রাজ্য সরকারের কোনও ব্যবস্থাই নেই — প্রভাস ঘোষ

এস ইউ সি আই রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ ২৫ মে এক বিবৃতিতে বলেন —

গত দু'মাস ধরে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে মাঠঘাট শুকিয়ে থাকা সত্ত্বেও একদিনের বর্ষায় সমুদ্র উপকূলবর্তী নদীবেষ্টিত দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার কুলতলি, বাসন্তী, গোসাবা, পাথরপ্রতিমা, রায়দিঘি ও ক্যানিং থানা সহ জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা জোয়ারের জলস্রোতে নদীবাঁধ ভেঙে প্লাবিত হওয়ায় হাজার হাজার মানুষ জলবন্দি হয়ে পড়েছেন, এই মুহূর্তে গ্রামগুলির বাড়িঘর সব জলমগ্ন অবস্থায়। আশ্রয়হীন হয়ে প্রাণ হাতে করে একটু নিরাপদ আশ্রয়ের আশায় মানুষ গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে। বৃষ্টির জল এবং বাঁধভাঙা নদীর জল হু হু করে বাড়ছে। রাত্রে আরও ভয়ানক বিপর্যয়ের আশঙ্কায় মানুষ আতঙ্কিত।

রাজ্য সরকার জলবন্দি মানুষের উদ্ধার ও ত্রাণের কোনও ব্যবস্থা করেনি। এরকম একটা প্রাকৃতিক বিপর্যয়কে মোকাবিলা করতে রাজ্য সরকারের কোনও ব্যবস্থা নেই। দীর্ঘকাল ধরে নদীবাঁধগুলির কোনও সংস্কার হয়নি। ফলে জোয়ারের জল দুর্বল বাঁধের ফাটল দিয়ে ঢুকে বাঁধ ভেঙে দিয়ে এই বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। এই অবস্থার জন্য শুধু বৃষ্টি বা জোয়ারের জল নয়, সিপিএম সরকারও দায়ী। আমরা এই অবস্থা মোকাবিলা করতে সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি ঃ

১) অবিলম্বে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় সামরিকবাহিনীর সাহায্য নিয়ে জলবন্দি বিপন্ন মানুষদের উদ্ধার ও নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

২) উপযুক্ত পরিমাণে ত্রিপল, শুকনো খাদ্য, পানীয় জল, ওষুধ ও ত্রাণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩) নদীবাঁধগুলি দ্রুত মেরামত করতে হবে। আসন্ন বর্ষায় জল ও জলোচ্ছ্বাস রোধে নদীবাঁধগুলি উপযুক্ত ভাবে সংস্কার করতে হবে।

৪) ক্ষতিগ্রস্তদের গৃহ মেরামত ও নির্মাণের দায়িত্ব সরকারকে নিতে হবে।

# মহাকরণে কর্মচারীদের মিছিল

ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট স্ট্রাগলিং এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরাম সহ আটটি সংগঠনের মোর্চা মহাকরণ সংগ্রাম কমিটির ডাকে ২০মে প্রায় পাঁচশো কর্মচারীর এক মিছিল সংগঠিত হয়। পঞ্চদশ লোকসভার নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর, বিশেষ করে রাজ্যে সিপিএম ফ্রন্টের নির্বাচনী বিপর্যয়ের পরে কর্মচারীদের নানা দাবিতে এই মিছিল কর্মচারীদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। সাধারণ কর্মচারীরা মনে করেন, এই বিশেষ পরিস্থিতিতে কর্মচারীদের আন্দোলন গড়ে তুলে, সরকারের ধামাধরা সংগঠন রাজ্য কো-অর্ডিনেশন কমিটির কর্মচারী স্বার্থবিরোধী চরিত্রটি উন্মোচন করা জরুরি।

মিছিলের দাবি ছিল, ১ ফেব্রুয়ারি, ২০০৬ থেকে সমস্ত বকেয়া নগদে দিতে হবে, ডি এ-র স্থায়ী আদেশনামা প্রকাশ করতে হবে, আন্দোলনের কর্মীদের উপর থেকে সমস্ত শাস্তিমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে, কেন্দ্রীয় হারে শিক্ষাভাতা, পরিবহণ ভাতা দিতে হবে, ৩০ শতাংশ বাড়িভাড়া ভাতা দিতে হবে, স্টেট আর্কাইভসের মতো সেক্রেটারিয়েটের দপ্তরকে ডাইরেক্টরেট করা চলবে না, প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির কর্মচারী স্বার্থবিরোধী সুপারিশ বাতিল করতে হবে।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এস ইউ সি আই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮, লেনিন সরণী, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক গণদাবী প্রিন্টার্স এ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত। সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২২৭১৯৫৪, ২২২৬০২৫১ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৪-৫১১৪, ২২২৭-৬২৫৯ e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.suci.in